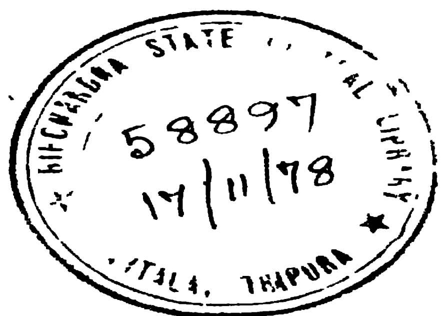
প্রতিবেশিনীর কাছে

চিত্ত ভট্টাচার্য



ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
প্রফুল্ল ঘোষ
৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ

প্রচ্ছদশিল্পী : সুমুখ মিত্র

মূল্য : চার টাকা

মুদ্রাকর :
প্রবীণ কুমার হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
১০, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা—৬

কীর্তিমান কথা সাহিত্যিক
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের করকমলে
এই গ্রন্থ পরম মুগ্ধতা ও নিবিড় শ্রদ্ধায়
অর্পণ করিলাম।

প্রথম দিবস
১৩৭৭

বিষয়ক্রম

প্রতিবেশিনীর কাছে ১. শার্ল বদলেয়র ২১. তালা ৩৪. আধুনিক বাংলা কবিতা ৩৭. নতুন গল্পরীতি ৪৯. স্মৃতিতীর্থ চিল্কা ৫৮. চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৬৬. ধার করার সপক্ষে ৭৫. উলট পুরান ৮২. দেউল পরিচিতি : কোনারক ৯১. 'অচলায়তন' প্রসঙ্গে ১০৩. শিবু মাঝির গান ১০৯. মুদ্রাদোষ ১১৪.

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- কাব্যগ্রন্থ

পত্ররাগ

ঝরণাতলার নির্জনে

পাঁকে-পদ্মে (যন্ত্রস্থ)

- গল্পগ্রন্থ

ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা

দৃশ্যান্তর

মধ্যদিনের গান

- কিশোর সাহিত্য

ফোয়ারা

- উপন্যাস

কামমোহিতম্

অন্ধকারের রঙ (প্রকাশিতব্য)

প্রতিবেশিনীর কাছে

আমার সোনামণিরে
ও যাদু মণিরে,
হেলিয়া দুলিয়া নাচো
ফণা মেলিয়া।
ও কেলে সোনারে ॥
লোহার বাসরে লখাই
সুখে নিদ্রা যায়
লখাই সুখ-নিদ্রা যায়
দংশিয়া কি সুখ পেলি
লখাই সোনার পায়।
ও সব্বনাশীরে ॥

হেতমপুরের মেঠো রাস্তা ধরে চলতে চলতে দাঁড়িয়ে গেলাম ছোট খাট ভিড়টায় মিশে। বীরভূমের সুখ্যাত বেদের দল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে সদ্যধরা কালনাগিনীর ঝাঁপি খুলে খেলা দেখাচ্ছে। ফটো তুলতে গেলাম। নাচতে নাচতেই চোখ ঠারিযে বলল—সবুর করুন বাবুমশাই। শিবঠাকুর হয়ে পোজ নিয়ে দাঁড়াই, ত্যাখন তুলবেন। শান্তিনিকেতনের বাবুরা শিখিয়ে দিয়েছে। মহাকালরূপিণী কেউটে ফণা মেলে গর্জিয়ে ওঠে। নৃত্যরত বেদে সেই উদ্যত ফণায় হেসে হেসে গান গেয়ে গেয়ে চুমো খেয়ে কেউটের

মাথাটাকে স্রেফ মুখের মধ্যে চালান করে দেয়। সাক্‌রেদরা ধুয়ো থামায় না, ও···যাতুমণিরে।

তখন আকাশের গায়ে শরতের স্তূপীভূত সাদামেঘের আনাগোনায় রৌদ্র ছায়ার খেলা। বাঁশতলার নীচে একদিকে জনকয়েক পুরুষ আর ওদিকে মেয়েরা। ছোট ছোট ছেলেপিলেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে দাঁড়িয়ে। বাঁশীর সুরে, হাতের তালিতে, ডমরুর আওয়াজে, সর্বোপরি সেই বিচিত্র তানলয়ের অনবদ্য সুষম ছন্দে গাওয়া গানের আমেজে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কারণ এই পরিবেশ ছেড়ে যেতে মন সরছিল না। কী নাচই না নাচছিল। শুধু কি বেদের দল? যেন সমস্ত পরিবেশটাই। মৃদুবায়ু-আন্দোলিত বনস্পতির শিহরণ, বাচ্চা ছেলেদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি, হুঁকোয় টান দিতে দিতে পুরুষদের মাথা নাড়ানো আর এ ওর কাঁধে হাত রেখে জট পাকিয়ে থাকা মেয়েদের ঢলাঢলি—মালেরা হেসে খুন,' নেচে খুন। চোখে মুখে রসের রঙ। নাচতে নাচতে গিয়ে দাঁড়ালো বারেকের জন্যে মেয়েদের সামনে। হাতে ধরা সাপ ফণা মেলে ফুঁসছে। কাণ্ড দেখে তো তারা শিউরে উঠে জড়িয়ে ধরল একে অপরকে নিবিড়ভাবে। আর ওরই মধ্যে নিকষ কালো পাথর কুঁদে ত্রিভঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিমার মতো যৌবনবতীর কাছে চোখের স্বপ্ন বুঝি বেদের গলায় জোয়ার নিয়ে এল—ও সব্বনাশীরে ·· ·।

চকিত বিদ্যুতে মেয়েটি চোখ ঠেরে বলল—আঃ মর। ওর সখীরা খিলখিলিয়ে উঠল। মালের হাতে ডমরু কুড়কুড়িয়ে বাজল দ্রুততম ব্যস্ততায়।

না, এবার আমি কোথাও যাইনি—পুরী, দীঘা, দার্জিলিং অথবা জমকালো কোন প্রসিদ্ধ শহরে। শারদ অবকাশে আমার প্রতিবেশিনীর কাছে অতিথি হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি অনুদ্বেগ স্বাচ্ছন্দ্যে, পরিচিত-অপরিচিত জনের মধ্যে। কত না স্মৃতির রেণু জড়িয়ে

ছড়িয়ে আছে এর রাঙা ধূলোয়, এর অনতিউচ্চ টিলায়, কঙ্করাকীর্ণ পথের উত্থান পতনে।

সাধক প্রবর বামাক্ষ্যাপা, নিত্যানন্দের সাধনভূমি এই বীরভূমে চণ্ডীদাস, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথের কত না লীলা! নন্দকুমার, লর্ড সিন্‌হার মতো ব্যক্তিত্ববান পুরুষদের বুকে ধারণ করে বীরভূম গর্বিত। সে গর্বের শেষ নেই। জিতেন বাঁড়ুজ্জ্যে, কুলদা মল্লিক, সজনী দাস, তারাশঙ্কর, রামরঞ্জন চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনী দাস, পূর্ণ দাস—নামের অন্ত নেই। নাম নয় যেন নামাবলী।

গল্পে-গানে-কাব্যে-উপন্যাসে, আউল-বাউল-তন্ত্রে-মন্ত্রে, বেদের গানে, আকাশ ছোঁয়া প্রান্তরের অঢেল ব্যাপ্তিতে, প্রবাহিত জলধারার অজস্রতায় বীরভূম, তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অসাধারণ।

ট্রেনে বাসে-রিক্সায়, কখনও বা পায়ে হেঁটে অথবা নৌকোয় কিংবা জীপ গাড়ীতে, একাঘ বীরভূমকে দেখে বুঝি সাধ মিটছিল না। হৈমন্তিক শস্যভারে সমৃদ্ধ মাইলের পর মাইল মূর্তিমতী কল্যাণী, সবুজে সোনায় ঢলোঢলো। নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে মনোহারিণী! পর্যাপ্ত সবুজ ধানক্ষেতের অকূলে মধ্যে মধ্যে পেকে ওঠা আউস, সোনালী বিন্যাসে ইন্দ্র দুগারের ল্যাণ্ডস্কেপের কথা মনে পড়ায়।

প্রধানতঃ বীরভূমের এই কাঁকুরে মাটি, ওষধি সকলের পক্ষে যথেষ্ট উর্বরা হলেও এখানে শাল, মহুয়া, মুরগা, অর্জুন, বিড়িপাতা তাল, জাম, হরিতকী, পিয়াল, কেঁদ প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর বৃক্ষ ছাড়া অন্যান্য বৃক্ষের সমারোহ কম। কারণ কাঁকুরে মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বেশী থাকে না। তাই গ্রীষ্ম আসতে না আসতেই বীরভূমের প্রকৃতিগত রূপ যায় পালটিয়ে। সে তখন রুদ্র-ভৈরব। রবীন্দ্রনাথের “বৈশাখ” কবিতার প্রতিটি বাক্যের যেন মূর্তিমান সত্তা।

প্রতিবেশিনীর কাছে

—তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্থলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী হিয়া
চিন্তায় বিকল
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

পূজোর ছুটিতে বীরভূমের পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়েও কিন্তু কিছুতে মনে আনতে পারছিলাম না. যে, এই রূপ ঝরে যাবে। কারণ বিয়োবার দেরী নেই······শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে।

সবুজ-সোনার বন্যায় অক্ষিপটে তখন অন্য কোন ধূসর লোলুপ চিতাগ্নি শিখার লেহি লেহি বিরাট অম্বরের ছবি শত সহস্র চেষ্টাতেও আসে না। তার সঙ্গে এ ধারণাও কিছুতেই আসছিল না যে এত যে শস্য, এই যে আকাশ ছোঁয়া ধানের বান ডেকেছে মাঠ জুড়ে, এদেশের মানুষের অন্ন কষ্ট হয় কেমন করে—আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না।

কোথায় উঠব না উঠব ঠিক করতে না পেরে বর্ধমান থেকে সিউড়িতে এসে হাজির হলাম। একদিন জিরিয়ে হাজির হলাম বক্রেশ্বরে। দেবীর ভ্রূমধ্য এই স্থানে পড়ে পীঠস্থান হিসেবে গণ্য। কয়েকটি উষ্ণ জলের কুণ্ডের ধূমায়িত বাষ্পে গন্ধকের ঝাঝালো ঘ্রাণ। ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করে প্রায় ফুটন্ত জল উদ্গত আবেগে বের হয়ে আসছে এবং সকল জলস্রোত এসে "পাপহরা" নামক দীঘিতে আশ্রয় নিয়ে নিষ্ক্রমিত হচ্ছে। এই দীঘিতে স্নানের ব্যবস্থা। দক্ষিণদিকের শ্মশানে অঘোরীবাবার আশ্রম। উত্তর ও দক্ষিণদিকের শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করা হচ্ছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস দিনান্তে একটি অন্ততঃ শব আসবেই। বিভিন্ন তাপমাত্রার কয়েকটি কুণ্ড ছাড়া একটি শীতল জলের কুণ্ডও আছে

এবং স্বল্প পরিধির মধ্যে আবদ্ধ স্থানে পাশাপাশি শীতল ও উষ্ণ কুণ্ড থাকায় স্বভাবতই বিস্মিত হবার কারণ থাকে। আর সেই বিস্ময়টিকে সম্বল করে নানাবিধ সংস্কার গড়ে উঠেছে। চারিধারে শত শত নাতিবৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই শ্মশানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বাদ দিলেও গরীব পাণ্ডাদের মুখে অনর্গল বর্ণনা শুনতে মন্দ লাগে না।

বক্রেশ্বরের কুণ্ডগুলি নিয়ে যে কথিকাটি প্রচলিত, সেটি হচ্ছে এই যে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ভগবান বিষ্ণু জীবহত্যার পাপের জ্বালায় যখন অস্থির, তখন সেই জ্বালা মহাতাপস অষ্টাবক্র নিজে গ্রহণ করলেন বিষ্ণুকে জ্বালা-মুক্ত করতে। গৃহীত সেই জ্বালায় অষ্টাবক্রমুনির শরীর সন্ত্রস্ত অস্থির। পরম বিচক্ষণ বিষ্ণুর অভিপ্রায়ে সকল তীর্থ হতে উৎসারিত বারিধারা বিরামহীন আবেগে মুনিকে স্নান করিয়ে শান্তি দিতে লাগল। জ্বালা-যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুনির অঙ্গধৌত জলধারা তাই এত উষ্ণ, অসহনীয়।

উষ্ণতম কুণ্ডটির জল প্রায় ৭০° সেঃ গ্রেঃ তাপে উদ্গত হচ্ছে। এই অগ্নিকুণ্ডের জল পান করলে অনেক জটিল ব্যাধি দূরীভূত হয়। অনায়াসে এখানে একটি সরকারী স্বাস্থ্য-নিবাস গড়ে তোলার কথা ভাবা যায়। সত্য মিথ্যা জানি না, শোনা কথা, নিঃসৃত জলের পরীক্ষায় রেডিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাপহরা দীঘিতে স্নান করলে শরীর অপূর্ব আরামে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এর জলে সাবান জলের মত পিছল ক্ষার জাতীয় বস্তুর আধিক্য থাকায় বস্ত্রাদি ও অঙ্গ ধৌত করলে মালিন্য দূরীভূত হয়।

রাজগীরের উষ্ণ প্রস্রবণগুলির সঙ্গে তুলনা করব না। সেই মোহন সমৃদ্ধ স্থানের কথা চিন্তা করেও বলা চলে বক্রেশ্বরের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও সংস্কার যদি করা হয় তা হলে প্রদেশ সরকারের অর্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে যথেষ্ট সুবিধা হবে বলে মনে হল।

প্রতিবেশিনীর কাছে

বক্রেশ্বরের পর মাসানজোড়ে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর "কানাডা ড্যাম"। ময়ূরাক্ষীকে বাদ দিলে বীরভূমকে ভাবাই চলে না, যদিও আরও কতই নদী না দেখলাম—অজয়, কোপাই, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর, চন্দ্রভাগা, পাগল, চিলাই। যেমন তাদের রূপ তেমনি নামের বাহার। ময়ূরাক্ষী আজ বাঁধা পড়েছে মানুষের হাতে। মানুষে মেশিনে মিলে তার খামখেয়ালীপনার মধ্যে অতিকায় ২১০০ ফুট লম্বার ও ১৫০ ফুট উচ্চতার এক সুবিশাল বাঁধ বেঁধে দিয়েছে। ইচ্ছে করলে বাঁধের ওপিঠ থেকে এক ফোঁটা জলও নেমে আসতে পারবে না। একদা আতঙ্কের কারণ ময়ূরাক্ষী আজ বীরভূমের বরদাত্রী প্রাণদা। এক দিকে হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটি, অন্য দিকে জলসেঁচের ব্যবস্থা। সিউড়ি থেকে মাসানজোড় যাবার পথে তিলপাড়া ব্যারাজ পড়ে। এখান থেকেই সেচব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ময়ূরাক্ষীকে নিয়ে আয়োজনের ত্রুটি নেই। দৃষ্টি-নন্দন পরিবেশে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে-আসা জলধারাকে বাঁধ দিয়ে আটকিয়ে যে কর্মকাণ্ড রচিত হয়েছে তা দেখলে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কল্যাণময় মূর্তির প্রতি অবাক শ্রদ্ধায় হৃদয় আপ্লুত হয়। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটি বিশ্রাম ভবনের সুচারু অবস্থান, পাথর উড়িয়ে চমৎকার ঘুরপাক খাওয়া রাস্তা, সুসজ্জিত বাগিচা প্রভৃতি মিলে মিশে অভিভূত হবার মতো দৃশ্য, এই কানাডা ড্যামের পরিবেশ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে জলসেচের জন্য এত উদ্যোগ, এত আয়োজন, সেই জল ব্যবহার করার ক্ষমতা কৃষককুলের সর্বস্তরে সমান ভাবে উৎসাহ জাগাতে পারছে না, নির্ধারিত হারে জলকর দেবার মতো সঙ্গতি না থাকায়—এ সংবাদ যখন কানে আসে তখন স্বতঃই অমন সুশোভন পরিবেশেও মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

মাসানজোড় থেকে ফিরে বাসে হেতমপুর। একটি বর্ধিষ্ণু ও ঐতিহ্যশালী গ্রাম হিসেবে হেতমপুরের চমৎকারিত্ব আজো বর্তমান।

প্রতিবেশিনীর কাছে

পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ কালের বিবর্তনে যুগপৎ প্রাচীন গৌরব ও বর্তমান অসহায়ত্ব নিয়ে বিষণ্ণতায় স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজকীয় কোলাহল আজ নেই। কিন্তু তাঁদের কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। যাঁর কীর্তি আছে তিনি যুগোত্তর মহিমায় জীবিত থাকেন। হেতমপুরের কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ শতবর্ষব্যাপী জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্রস্থল হয়ে পল্লী-বাংলার প্রায়-বিরল দৃষ্টান্তের উজ্জ্বল মহিমায় বিরাজিত।

হেতমপুরের গিরিডাঙার মাঠে টি বি স্যানাটোরিয়াম 'নিরাময়' লালগোলার রায় পরিবার, হেতমপুরের রাজ পরিবার, ইন্দিরা গান্ধী, কমৃত কাউর, এস. আর.দাস, বিধান রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অকৃপণ আগ্রহে জনকল্যাণের পবিত্রতম অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নির্মীয়মান প্রসারতার মাঝে দাঁড়িয়ে আলাপ করলাম কয়েকজনের সঙ্গে। বেডে অথবা করিডরে বসে-দাঁড়িয়ে থাকা যক্ষ্মাগ্রস্থ রোগীদের দেখছিলাম। এখানকার এই পরিবেশে একত্রে থাকাকালীন অবস্থায় ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করে সুস্থ জীবনের স্বাভাবিক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে। রঙ মেখে সাজ করে থিয়েটার করা থেকে পত্রিকা প্রকাশে, হাসি, গান, গল্পে সুস্থলোকদের চেয়ে কম যায় না। বিশাল প্রান্তরের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ আয়োজন। এখানেই আলাপ হলো ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা দুই শিক্ষার্থিনীর সঙ্গে। মুরগী-পালন পদ্ধতি সম্পর্কে উৎসাহ নিয়ে 'নিরাময়ের' নিজস্ব মুরগী-পালন কেন্দ্রে ওঁরা শিক্ষালাভ করছেন। মাস দুইএর মধ্যে বাংলা শিখেছেন কাজচলা গোছের। জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন লাগছে আপনাদের?

—ওয়াণ্ডারফুল!

রগড় করে বললেন আমার বন্ধু লেখক সঞ্জীব সেন—না না, বাংলায় বলুন।

একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে হাসতে হাসতে বলল—চমট্‌কার।

প্রতিবেশিনীর কাছে

সুখ্যাত ছড়া লিখিয়ে আশানন্দন চট্টরাজ হেতমপুরের বাসিন্দা। আল্লাপ হয়ে গেল প্রাণোচ্ছল সদালাপী যুবকটির সঙ্গে। 'নিরাময়'কে নিয়ে কবিতা লিখেছে স্যানাটোরিয়ামের পত্রিকায়।

············তুমি দেখ চেয়ে আমিও দেখছি
লাল রক্ত ঝরে পড়ে
ঝলকে ঝলকে পলকে পলকে
স্পুটামের পাত্র ভরে
জীবনের অমূল্য নির্ষাসে
কখনও বা নিশ্বাসে নিশ্বাসে
প্রেম প্রীতি ভালবাসা
কথা বলে কাঁদে আর হাসে
ধ্বনি তার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে
নিউ হলে, মাড হলে, কিচেনে, অফিসে

* * *

তুমি শোন সব
শোন এ জীবন কাঁদে
কালো রাতে পেচকের মুখে
শোন এ জীবন কাঁদে
মড়ি ঘরে, তুহিন মেঝেতে
রূপো ঝরা শেষ চুমু দিয়ে
শেষ চাঁদ ডুবে যায়—তাও দেখ চেয়ে।
শত বেদনার মাঝে
আশাবাদী তুমি 'নিরাময়'
অশ্বত্থ পাতায় হাসো
খল খল হাসি।

প্রতিবেশিনীর কাছে

শারদ অবকাশের কয়েকটা দিন এখান ওখান করে ঘুরে বেড়াচ্ছি খুশির পাল তুলে—অনুদ্বেগ শান্তিতে। কোন তাড়না নেই। ইচ্ছে হলে আলপথ ধরে হাঁটবার সময় ভালবেসে ধানের গুচ্ছের পরে হাত রেখে, অথবা ধানের জমি থেকে উঠে-আসা মখমলের মতো ঘাসের জাজিম বিছানো উঁচু ডাঙায় উঠতে গিয়ে কী চমৎকার ছোট ছোট লাল-নীল-গোলাপী-হলুদ-সাদা ফুলের বিচিত্র নক্সায় চিত্রিত পারশিয়ান কার্পেটের অভিজাত কোমলে বসে পড়েছি—বিস্মিত হয়ে—যেন মুঠো মুঠো হীরে-মোতি-পান্নার কুচি কেউ অতি অবহেলায় এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে।

নির্ভেজাল আড্ডা দেবার মনোভাব নিয়ে বের হলে কোথা থেকে যে কী ভাবে সব জুটে যায় ভেবেই পাওয়া যায় না। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকজন মিলে আমরা ছোটখাট একটা দলে পরিণত হলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যার আকাশেই বেশ বড় চাঁদের গোলাকার অঙ্গ থেকে প্রবাহিত লাবণ্য ঝরে ঝরে পড়ছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল এমনি এক সন্ধ্যায় গত বছরে কোজাগরী পূর্ণিমায় কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে বজরা ভাড়া করে বিশাল গঙ্গার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। ভাসমান সেই বজরা থেকে মণিকর্ণিকার ঘাটে চিতাগ্নির লেলিহান শিখা, শত শত মন্দির থেকে ভেসে-আসা সন্ধ্যারতির নিনাদিত পবিত্রতা, মায়াময় জ্যোৎস্নায় মিশে যে অনাস্বাদিতপূর্ব রোমাঞ্চকর অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল, তা বলার নয়। এবং পূর্বের সেই স্মৃতি মনে আসলেও আমার কিন্তু মন্দ লাগছিল না মিলে মিশে হৈ হৈ করে জ্যোৎস্নাস্নাত হেতমপুরের বিশাল মাঠের ওপর গল্পে কথায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হতে। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেবার জন্য পা ছড়িয়ে সবাই বসছিলাম।

আমাদের দলে দু'তিনজন ভালো গায়ক গায়িকা ছিলেন। (না থাকলেও বুঝি ক্ষতি ছিল না। কারণ এমন সুন্দর ফুটফুটে

প্রতিবেশিনীর কাছে

লক্ষ্মী পূর্ণিমায় গান গলায় এমনিতেই ফেনিয়ে ওঠে; গাইবার গলা থাক আর না থাক)। 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে···'বহুশ্রুত এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি বিস্তীর্ণ মাঠের আলোর প্লাবন ভেদ করে আমাদের হৃদয়গত আনন্দকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমরা যারা গান গাইতে জানি না, তারাও কথাগুলি উচ্চারণ করছিলাম যে ৎসাহে,—'একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে। গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আরেকজন গাবে মনে।' এর পরের গান—'জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে।' কি চমৎকার করেই না গাইছিলেন বন্ধুর দল। সেই পরিবেশ, যেন সুষম তালে সঙ্গত করে চলেছিল; যা কানে শোনা যায় না, কিন্তু হৃদয়ে অনুভূত হয়। দেখতে দেখতে গানের স্রোত নেমে এল। সময়ের প্রতি কোন সম্ভ্রমবোধ অথবা শেষ শরতের রাত্রির ঝরা শিশিরের আক্রমণের ভয় আমাদের ছিল না। আমরা উঠছিলাম, বসছিলাম, চলছিলাম। আকণ্ঠ ধানক্ষেতের স্রোতে হাবুড়বু খেতে খেতে চকিতে শহরের খাঁচায় দম দেওয়া পুতুলের জীবনের নারকীয় অস্তিত্বের কথা ভেবে তন্মুহূর্তে আত্মহত্যা করতে মন যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দিন কয়েক পরে আমাদের ফিরে যেতে হবে। অপ্রতিরোধ্য সভ্যতার শাসনে যান্ত্রিক জীবনে এই আনন্দ-স্মৃতি, সুখের বদলে বেদনাকে তীব্রতর করে তুলবে। আমার চিন্তায় ছেদ পড়ল। খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। কানে এল এগিয়ে যাওয়া বন্ধু-দলের দরাজ গলার এক সঙ্গীত—'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' এ গান বহুবার শুনেছি, শুনব বহুবার। কিন্তু উজ্জ্বলতম পূর্ণিমার অমল জ্যোৎস্নায় বান-ডেকে-যাওয়া শিহরিত পরিপূর্ণ শস্যের অফুরন্ত উল্লাসের মধ্যে যে আবেগে গানটি গীত হচ্ছিল তার তুলনা মেলা ভার। হাঁটতে হাঁটতে আমরা অবশেষে হাজির হলাম শেরিনা বিবির কবরে। রাত তখন বারোটা। নির্জন সেই উন্মুক্ত

প্রতিবেশিনীর কাছে

প্রান্তরে গুটি কয়েক ব্যক্তির শব্দিত কোলাহলকে বুঝি বড় বেমানান লাগছিল। টর্চ জ্বেলে আমরা ছোটখাট সেই কবর-ঘরের মধ্যে ঢুকে শ্রদ্ধানত চিত্তে খানিক দাঁড়িয়ে স্মরণ করলাম বিগত দিনের প্রেম-মুগ্ধা বীরাঙ্গনা আমিনা, ওসমান আর তাদের শিশু কন্যাকে। ওখান থেকে সামান্য অগ্রসর হয়ে সকলে বসলাম হাফেজের বাঁধের গর্ভে। মজে যাওয়া সেই রমণীয় বাঁধের সকল স্থানে জলের অস্তিত্ব নেই। অনতিদূরে জলের উপর প্রতিভাত চাঁদের আলো চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। স্মৃতির পাত্র উপচেও বুঝি এক ব্যথিত বেদনা নিঃশব্দে ঝরে পড়ে।

মুঘল হারেমের হুরী আমিনা আর তার রূপমুগ্ধ প্রেমিক ওসমান মিলিত এক স্বপ্নের হাতছানিতে পালিয়ে এসেছিল এই রাঙা মাটির দেশ—হেতমপুরে। বাদশাজাদার রোষ এড়াবার জন্য আমিনা হ'ল শেরিনা, ওসমান হাফেজ। তারপর তাদের মিলিত জীবনের সুখের লগ্নগুলি প্রজাপতির মতো ডানা মেলে ওড়াওড়ি করতে লাগল। বিশাল বাঁধের জলধারার উপর প্রমোদ তরণী বেয়ে কামনা-কল্পিত মোহন আবেশের শান্ত আশীর্বাদে ওরা বিভোর হয়ে একান্ত যৌবনের নির্মলতায় তলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। শয়তান কিন্তু পলকের জন্যে ঘুমোয় না ; কারণ তার চোখের পাতা নেই। অতন্দ্র নিরলস চাঞ্চল্যে চক্রান্ত করল বাদশাজাদার ভাইপো : আমিনাকে তার চাই। এসে হাজির হ'ল হেতমপুরে ওদের স্বর্গীয় বাগানে। না, এবার সাপ হয়ে নয়, ফকিরের ছদ্মবেশে।

ভাগ্য গণনার ভূয়ো পারদর্শিতার কথা রটিয়ে হাফেজ শেরিনার সাতদিনের শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ বিচার করতে বসল, এবং কন্যাটি নেহাতই শিশু, হস্তরেখা স্পষ্ট নয় এই অছিলায় তার বাপ মায়ের হাত দেখতে দেখতে শ্বাপদের দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিল ওদের মুখাবয়বে। হাফেজ শেরিনার নামের অন্তরালে ওসমান আর

আমিনাকে চিনতে তার দেরী হলো না। ফিরে গিয়ে সেই বেইমান বর্গীদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে আমিনাকে বিবি করার নেশায় আক্রমণের ব্যবস্থা করল ওদের অকলঙ্কিত স্বপ্নের প্রাসাদ দুর্গকে। শেরিনার সুর্মাআঁকা ডাগর চোখের তারায় তখন কিন্তু ভয় নয়, ঘৃণার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাই শুধু হাফেজ নয়, শেরিনাও ঝাঁপিয়ে পড়ল খোলা শমসের হাতে সিংহীর ভীষণতায় দুর্দান্ত বর্গী সেনানীর মাঝে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাফেজ লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত হয়ে মাটির বুকে। অসহায় শেরিনা ছুটল প্রাসাদে। শিশুকন্যাকে পিঠে বেঁধে ঝাপ দিল প্রাসাদশীর্ষ হতে বাঁধের শীতল জলে। মূর্খ শয়তান মিলিত প্রেমের মহিমা দেখে মাথা ঠুকতে লাগল।

মধ্য রাত্রিতে হাফেজ খাঁর বাঁধের ওপর বসে আমি সেই শয়তানের মাথা ঠোকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।

হেতমপুরের মায়া কাটিয়ে পরের দিন রিক্সা চেপে দুবরাজপুর। ওখানেই, পাহাড়েশ্বরে মামা-ভাগনেকে দেখলাম। ছোটবেলায় ‘জ্ঞানের আলো’ বইয়ে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটির উল্লেখ ছিল—পিসার হেলানো টাওয়ার। জানি না কেমন সে বস্তু। হঠাৎ দুবরাজপুরের সমতল ভূমিতে একরাশ বিরাট গোলগাল পাথরের চাঁই দেখে হেলানো টাওয়ারের কাল্পনিক মূর্তি বুঝি ভেসে উঠতে চায়। অসংখ্য নিটোল পাথরের বুদ্বুদের ওপর পাথুরে বুদ্বুদ তাদের বিশাল ভয়ানক শরীর রেখে যেন দুবরাজপুরের মাঠে সার্কাসের ব্যালান্সের খেলা দেখাচ্ছে। ছোট্ট একরত্তি পাথরের ওপর বিরাট, বিরাটের ওপর ছোট্ট,—অন্ততঃ ঐ ভূখণ্ডে যেন মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে উপহাস করে অনায়াসে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাথরে পাথরে ওঠানামা করার সময়ে মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যদি এই সময় ঠিক এই পাহাড়েশ্বরে ভূমিকম্প হয় তাহলে

কি কাণ্ডই না ঘটবে নিমেষে। কার ঘাড় কে সামলাবে, নাকি সব একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেয়ে ঠোকাঠুকি করতে করতে আশপাশের ঘরবাড়ী গাছগাছালি ভেঙ্গে হুরহুরিয়ে নিউটনের গতি সূত্রের প্রথম আইনটিকে প্রমাণ করার জন্য অনন্তকাল সমবেগে, সরল রেখা ধরে ছুটতেই থাকবে। মনে হওয়ার সেই ভয়াবহ বিচিত্র দৃশ্যের কল্পনা করতে করতে নেমে এসে রিক্সায় উঠলাম।

রিক্সাওয়ালা নতুন কিছু তথ্য পেশ করল। বলল—বাবু, অই যে দেখছেন একেবারে মাথায় দুটো পাথর; ওর একটা মামা, আরেকজন ভাগ্নে। কখনও শরীর ফুলিয়ে মামা বেড়ে ওঠে, কখনও বা ভাগ্নে। আরও কি একটা বলার জন্য রিক্সাটা প্রায় থামিয়ে আনল। গদ গদ ভাবে শোনাল—এখানে এক সিনেমা পার্টির লোক এসেছিল ফটো তুলতে। এই দেখুন সেই পুকুর, বাস ষ্ট্যাণ্ড। এখানেই মারামারি হয়। ওদের সঙ্গে ছিলেন একজন মেয়েমানুষ, বুঝলেন বাবু।

বললাম—তুমি গাড়ী চালাতে চালাতে বলো। নইলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের "অভিযান" এর শ্যুটিং এর গল্প শুনতে শুনতে ষ্টেশনে এসে হাজির হলাম।

ট্রেনে করে বীরভূমের প্রায় উত্তর সীমান্তের গ্রাম মুরারইয়ে যখন এলাম তখন বেলা প্রায় দুটো। যাঁর বাড়ীতে উঠব সেই মুরারই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমার প্রায় অপরিচিত। ওঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে মাস কতক আগে ওঁর একখানা কবিতা সঙ্কলন প্রকাশনার বিষয়ে পরিচিত হই। ওঁরা তখন অন্যত্র ছিলেন। সেই সূত্রেই আলাপ। তবে না জানিয়ে এতগুলি লোকের অসময়ে উপস্থিতির ব্যাপারে যথেষ্ট সঙ্কোচ হলেও এসে দরজায় কড়া নাড়লাম। দরজা খুলেই কিন্তু হৈ চৈ লাগিয়ে দিলেন। ওঁদের

আন্তরিকতার উষ্ণতা ভোলবার নয়। সন্ধ্যায় সতরঞ্চ পেড়ে বসে ক্রাইম ও ক্রিমিনাল সংক্রান্ত রোমাঞ্চকর গল্পে, বেড়াতে আসা পাড়া পড়শীদের গানে আড্ডা জম-জমাট হয়ে উঠল। খাওয়া দাওয়ার শেষে সামনের আয়তাকার পুষ্করিণীর তলদেশের অতলতায় প্রতিবিম্বিত চাঁদের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবছিলাম ওঁদের কাছে শোনা সেই বৃটিশ আমলের মুরারই থানা ইন্সপেক্সনে আসা বিদেশী অফিসারের কথা। উনি একা আসেন নি ; সঙ্গে মেমসাহেবও ছিলেন। থানার মাঠে ঘোড়াটা বাঁধা ছিল। ঘোড়া দেখেই সাহেব তো আনন্দে বেসামাল। কোথায় ইন্সপেক্সন কোথায় কি ? ঘোড়া-পাগল সাহেব ঘোড়ায় চাপবার জন্য অস্থির। তৎকালীন অফিসার-ইন্-চার্জ অনেক বোঝালেন—ঘোড়াটা বেয়াদপ, নতুন সওয়ারী পিঠে চাপালে মাথা গরম করে উল্‌টে ফেলবার চেষ্টা করবে। কে শোনে কার কথা। সাহেবের জিদ চেপে গেল। যথারীতি সাজসজ্জা পরিয়ে যেই না চাপা—দে ছুট্। চোখের পলকে টগ্‌বগিয়ে হাওয়া। মেমসাহেব চোখ বুজলেন দু'হাত দিয়ে। সেই ঘোড়া ফিরল ঘণ্টা ছ'য়েক পর।

কিন্তু সওয়ারী কই ? রেকাবে আটকে থাকা একখানা পায়ের সঙ্গে তালগোল পাকানো ধুলো বালি মাখানো মাংসপিণ্ড। একবার দেখা দিয়েই ঘোড়া আবার পালাল দিশেহারা হয়ে। স্বামী শোকে উন্মাদিনী মেমসাহেব দিন দুই অপেক্ষা করলেন থানায় লোডেড রিভলবার নিয়ে—আই উ'ল শ্যুট দ্যাট সোয়াইন।

বিদেশিনী মহিলার সেই নিনাদিত আর্তনাদের কোন আওয়াজ এই নৈশ নির্জনতায় ধ্বনিত হচ্ছিল না বটে, তবে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এখানকার থানার ঘোড়াটাকে একটা কুৎসিত জীব বলে মনে হচ্ছিল।

পরের দিন দুপুরে এক্কায় চেপে মাইলের পর মাইল সুশোভিত

প্রতিবেশিনীর কাছে

দৃশ্যপটের মাঝ দিয়ে বাঁধানো অথবা কাঁকুরে রাস্তা ধরে আমরা বেড়ালাম। দূর দূরান্তে সাঁওতাল পরগণার তরঙ্গায়িত পর্বতমালা দৃশ্যমান অস্তিত্বে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিউড়ি থেকে মাসানজোড় যাবার পথে যেমন বাংলা-বিহার সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়েছিল, মুরারই থেকে বেরোবার সময়ও আমাদের সেই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। একদিকে বাংলা অপরদিকে বিহার সরকার বাহাদুরের রক্ষী পর্যায়ক্রমে বাঁশের আটক উঁচিয়ে রাস্তা করে দিল। দূরে শৈল চূড়ার অন্তরালে বিদায়ী সূর্যের রাগরক্তিমাভা গগন-পটের দিগ্বলয়ে রক্তের নদী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। দেখতে দেখতে রঙ পরিবর্তনের দ্রুত কারুকর্মে সমগ্র সেই ভূখণ্ডে অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। মুরারই ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এসেছিলাম। এক্কা-ওয়ালার ছিপটি খেয়ে ওর জরাজীর্ণ টাট্টুঘোড়া পক্ষীরাজের মতো গড়ানো রাস্তা ধরে ছুটছিল জোর কদমে। ধানভুঁই, বন জঙ্গলের মধ্যে চাপা অন্ধকার। আমাদের রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের তোরণের ফাঁক পথে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্নার উঁকি ঝুঁকি এবং অজস্র জোনাকির স্বপ্রভ মিট্‌মিটে আলোর বিকিরণ, একটানা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ লহরা, আমাদের কলরব, মহুয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে টলতে টলতে এক আধজন দেহাতী লোকের নি···ব্দে হেঁটে যাওয়া প্রভৃতি মিলে মিশে যে রোমাঞ্চকর জটিলতার সৃষ্টি করছিল—তা সত্যিই উপভোগ্য।

আশ্রয়স্থলে ফিরে এসে রাত্রে হাবিলদার মিরবহরের উপস্থিতিতে আলোচনা হল—তারাপীঠ যাওয়া হবে ভোরের গাড়ীতে। রামপুরহাট ষ্টেশনে নেমে রিক্‌সা যোগে মাইল পাঁচেক গিয়ে হাঁটা পথে দু'মাইল। হাবিলদার মিরবহর ইউনিফরমের অন্তরালে আসলে যে তারামায়ের সাক্ষাৎ সন্তান, খানিক পর বুঝতে পারলাম যখন হঠাৎ বললাম কথাপ্রসঙ্গে—পীঠস্থান থেকে ফিরতে তো দুপুর গড়িয়ে

বিকেল হবে। খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত ব্যবস্থাটা একটু ভাবা দরকার। নয় কি ?

মাথা থেকে পুলিশী লাল ক্যাপ সরিয়ে নাক-কান মলে "জয় তারা" "জয় তারা" করে বার কয়েক বিড় বিড়িয়ে উঠল। অমায়িক হাসিতে বিগলিত হয়ে জানাল—কিছু ভাববেন না দাদা। সব মায়ের ইচ্ছা। দেখবেন কোথা থেকে কী সব জুটে যাবে।

মুহূর্তেই সমস্ত সমস্যা জল হয়ে গেল। বুঝলাম—আর যাই হোক তারাপীঠ যাতায়াত ও দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখার কোন অসুবিধা হবে না। তা সত্ত্বেও ওর মুখ থেকে শুনব বলে জিজ্ঞেস করায় পরম অপরাধীর মত বলল—আমি কে ? তারা মা সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তারাপীঠে যাবার সময় মায়ের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করতে নেই।

—জয় তারা। আমরা সবাই সহাস্যে বন্দনা করলাম তারা মাকে। রাত্রের পরামর্শে মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি অযোধ্যাপতি দশরথের। রাম রাজা না হয়ে বনে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা কিন্তু মায়ের কৃপায় কোন অঘটনের সম্মুখীন না হয়ে সকাল সকাল সদলবলে দ্বারকা নদীর পাড়ে এসে উপস্থিত হলাম। নদীর ওপারে কিছুটা দূরে দেবীর মন্দিরের শিখররাজি চোখে পড়ল। নৌকোয় নদী পার হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম মন্দিরাভিমুখে। তখন সবে মাত্র মেলা শেষ হয়েছে।

ভাঙ্গা মেলার বেশ কিছু দোকানে লোকজনের ভীড়। সে সব পেরিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলাম। একটা পূত পবিত্র ভাব সর্বত্র বিরাজ করছে। সামনেই হাল ফ্যাসানের একটি নাটমণ্ডপ। আশেপাশে দু'চারটি সাধারণ মন্দিরতুল্য গৃহ। কোন কোনটিতে দু'একটি শিলামূর্তি রয়েছে কি নেই। মূল মন্দিরটি অবশ্যই দর্শনযোগ্য। পশ্চিম বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানকার

মন্দিরটিও খড়ে-ছাওয়া চালা ঘরের অনবদ্য অনুকৃতিতে গড়ে উঠেছে। ভেতরে সুসজ্জিতা দেবীমূর্তি দর্শন করলাম। শুনলাম আসল শিলামূর্তি দেখতে গেলে আরও সকালে আসতে হয়। নচেৎ স্নানাদি শেষে বেশবাস ও মুখোশ পরিয়ে দেওয়া হয়। যাই হোক আমাদের ভাগ্যে আর আসল মূর্তি দেখা হয়ে উঠল না। কিছুটা অতৃপ্তিভাব নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরের সম্মুখভাগের সমগ্র অবয়বটির পোড়া মাটির কাজের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলাম। অনিন্দ্য-সুন্দর বহুবিধ সুললিত নক্সা, পশুবলির দৃশ্য, ঘোটকারূঢ় সৈন্য, ময়ূর, মৃণালাশ্রয়ী পদ্ম, গোপিনীসহ কৃষ্ণ-রাধিকা, মধ্যস্থলে নিখুঁত মহিষমর্দিনীর মূর্তি প্রভৃতি বিগত দিনের মন্দিরগাত্র অলঙ্করণের বিশিষ্ট উদাহরণ নিয়ে দর্শককে অভিভূত করে।

মনে মনে কিন্তু ভাবছিলাম অন্য কথা। যে সকল ভীতিপ্রদ বর্ণনা শুনেছিলাম তারাপীঠ সম্পর্কে, কই, তার লেশমাত্র তো চোখে পড়ছে না এই সুভদ্র পরিবেশে! এমন কি একথা তো কাউকে বলা যায় না যে আমি তারাপীঠের মহাশ্মশানের পবিত্রতার মাঝে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর সেই স্থানমাহাত্ম্যকে উপলব্ধির আয়ত্তে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য অনুভব করতে পেরেছি।

মহাশ্মশানের দিকে পা বাড়ালাম। নেহাতই একটা জঙ্গল। ওখানে শ্মশান কোথা—মনে এই ভাব নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাঁদিকে সাধকোত্তম বামাক্ষ্যাপার সাধন-পীঠটি দেখলাম। ভক্তজনের অর্থানুকূল্যে গৃহমধ্যে একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, জায়গাটির স্বাভাবিক চরিত্রটি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে—মনে হল। এর পর আমরা গেলাম জঙ্গলের মধ্যে দুর্গম থেকে দুর্গমতর আরণ্যক পরিবেশে। গাছে গাছে অসংখ্য বানরদল তাদের পরিবার-বর্গ নিয়ে সকৌতুকে তাকিয়ে দেখছিল। বানরকদের মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আড়চোখে পিট-পিটিয়ে তাকিয়ে দেখার দৃশ্য ও

সর্দারদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গী দেখে যুগপৎ আনন্দ ও ভয় লাগছিল। ওদেরই জন্যে নিয়ে আসা সামান্য খাবারের খবর কি ভাবে টের পেল—কে জানে; সুটসুটিয়ে নেমে এসে ছেঁকে ধরল। পকেট থেকে বের করতে তর সয় না। গা-হাত আচড়ে ছিঁড়ে জোর করে খাবার কেড়ে নিয়ে যে যার চলে গেল। 'হাংরি জেনারেশনের' পূর্বপুরুষদের অবস্থা দে খ চক্ষুস্থির।

যতই এগিয়ে চলি ততই নিবিড় ভয়াবহ বীভৎসতা ঘনঘোর হয়ে আসতে লাগল, দীর্ঘ সেই দ্বারকা নদীর উপকূলবর্তী শ্মশানভূমির গভীরে। মাইল খানেক জুড়ে নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে শববাহকদের দল ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে কোথাও গর্ত খুঁড়ে চলেছে শব নামিয়ে মাটি চাপা দেবার জন্য। জ্বলছে দাউ দাউ করে চিতাগ্নি, কোথাও উঠছে বুকফাটা আর্তনাদ। পায়ে পায়ে মড়ার মাথার খুলি ও হাড় পাঁজরা—বিবর্ণ, কর্দম-লিপ্ত। কুকুর শৃগালের ভুক্তাবশিষ্ট কোন হতভাগ্যের শবদেহ, পূতিগন্ধময় নারকীয়তা, পোড়া কাঠ, শবাচ্ছাদিত ছিন্ন কন্থা, আধ পোড়া বাঁশ, খালি বোতল, ভাঙ্গা মালসায় যেন শত শত শ্মশানভূমির একত্রিত একটি ভয়ানক সমগ্রতায় তারাপীঠের মহাশ্মশান মহামৃত্যুর লীলাক্ষেত্র! হঠাৎ নিবিড় নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে কুকুরদের চীৎকার, মারামারি। শকুনের ডানা ঝটপটানির মিলিত কলরোল তাণ্ডব লীলাস্রোতের প্রত্যক্ষ রূপকে ইন্দ্রিয়গোচর করে। গা ছন্‌ছমিয়ে ওঠে আতঙ্কে, শরীর হিম হয়ে আসে। পথ চলতে সামনের গাছের ডালে কয়েকটি কঙ্কালের অনায়াস অবস্থিতি, বনমধ্যে ভ্রাম্যমান নেশাখোর ভৈরবীর একা একা ঘোরাফেরা, পঞ্চমুণ্ডীর আসন, আগাগোড়া নরকঙ্কাল ও মুণ্ডনির্মিত সাধনকুটির, না খেতে পেরে ফেলে দেওয়া খাদ্য কণিকার মাঝে যমকাকদের লাফালাফি, পুরাতন কিংবা সদ্যত্যক্ত সাপের খোলস—দেখতে দেখতে পরিচিত জগতের ছবিকে কল্পনার রাজ্য বলে মনে হয়। দার্শনিকতা

নয়, জীবনের মাধুর্য সম্পর্কে, বেঁচে থাকার পরম গৌরবময় ভূমিকা সম্পর্কে, মন একপ্রকার অসহায় বিব্রত চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তখনই মনে পড়ে সেই সব স্থিরপ্রজ্ঞ তান্ত্রিক সাধকদের—যাঁরা স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে বেছে নিতেন তাঁদের সাধন ক্ষেত্রসমূহকে, মহাশ্মশানের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাকে, তার যাবতীয় নির্মম সত্যকে। এই যে মাইল ব্যাপী শ্মশানভূমি, এর প্রতিটি স্থানের শীতল আশ্রয়ে কতকাল ধরে অগণিত শব প্রোথিত হয়ে আসছে, ভস্মীভূত হয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাচ্ছে—কে তার খবর রাখে ? চোখের সামনেই দেখলাম হাত তিনেক জায়গা খুঁড়তে গিয়ে ভূমধ্যে কোদালের কোপ পড়ল গলিত এক শবের মাথার ওপর। যে শবটি অপেক্ষা করছিল মাটির তলে সমাহিত হবার জন্য তারই উদ্দেশ্যে যেন আকাশ ফাটানো প্রতিবাদ ভেসে এল চূর্ণিত খুলি ভেদ করে—অন্য জায়গায় দেখ, না কি সে ঠাণ্ডা স্বরের আকুল মিনতি ভরা অপার্থিব গলায় অনুনয় করল—আমার মহানিদ্রিত শয্যার একটু পাশে জায়গা করে ওকে শুইয়ে দাও। যারা মাটি কাটছিল তারা সেই স্বর শুনেই বুঝি ওর মিনতিকে মর্যাদা দিয়ে মাটি চাপা দিল। কে ওরা ? কোথাও ওদের ঘর ছিল ? ঘরে কে কে ছিল ? কি হয়েছিল ওদের—কিছুই জানিনা ? তবে দেখলাম ওরা মিলে মিশে পাশাপাশি দুজনে শুয়ে রইলো। শুয়ে থাকতে থাকতে একেবারে মিলিয়ে যাবে একাত্মভাবে।

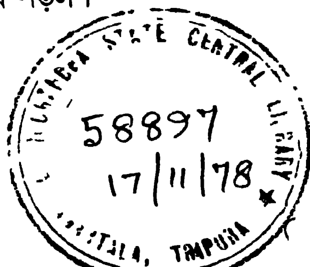
অতঃপর হাবিলদার মিরবহর ফেরার কথা তুলল। ওর কথা মনে রেখে যেটুকু সময় উদ্বৃত্ত ছিল তারই ভিতর জঙ্গলের মধ্যে এবং প্রান্ত সীমায় আমরা কিছু কিছু স্থায়ী সাধু সন্ন্যাসী ও ভৈরবীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য অগ্রসর হলাম। ছোট ছোট কুটিরে মাথা হেঁট করে ঢুকতে হয়। কমবেশী পরিচ্ছন্ন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে অথবা বাইরের দাওয়ায় বসে আলাপ আলোচনা হলো। লোকালয় বর্জিত এ ধরণের দুর্গম শ্মশানভূমে কিসের আশায়, এহেন অবস্থায় ওঁরা দিন

যাপন করেন, তার কোন নিগূঢ় কারণ তাঁরা ব্যক্ত করতে পারলেন না। সংসার-জীবনের দায় দায়িত্ব এড়িয়ে কিছু লোক এসে নির্বিঘ্নে তারাপীঠের স্থানমাহাত্ম্যের মহিমায় অভিভূত হয়ে জীবন কাটাতে চান। তাঁদের কেউ বা জীবনসংগ্রামে লাঞ্ছিত, কেউ দৈহিক ব্যাধিতে পীড়িত, কেউ বা অর্থনৈতিক চাপে পর্যুদস্ত এবং অনেকেই দেশবিভাগজনিত বিপর্যয়ের শিকার। এঁদের মধ্যে কোন তান্ত্রিক খোঁজ করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। বামাচারী তান্ত্রিকদের পঞ্চ ম-কারের সাধনার কোন ক্ষীণ রেশ এখানে বর্তমানে নেই। কাজেই শবসাধনা, ভৈরবীচক্র প্রভৃতি, গল্প শোনার পর্যায়ে চলে এসেছে, বদলে যা আছে, তা হচ্ছে—গঞ্জিকা। কম বেশী সাধু সন্ন্যাসিনীর দল গাঁজা সেবন করে বুঁদ হয়ে থাকেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন—শান্তি পাই বাবা। হাস্যকর নির্বোধ এই উত্তর শুনে কিন্তু হাসি পায় না। ওঁদেরকে দেখলে একপ্রকার মায়া পড়ে যায়। পকেট হাতড়ে সিকি, আধুলি উঠলে নামিয়ে দিতে দিতে বুঝি অজ্ঞাতসারেই বের হয়—রাখুন, সেবা করবেন।

অমায়িক হাসির নিস্পৃহতায় ওঁরা ঘাড় কাত করে আশীর্বাদ করেন।

এ রকম কত আশীর্বাদ, কত প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ, সর্বোপরি আনন্দমুখর কয়েক দিনের স্নিগ্ধ স্মৃতি নিয়ে আমরা ট্রেনে চড়ে বসলাম যে যার বাড়ী ফেরার জন্য। আসন্ন সন্ধ্যা লগ্নে বীরভূমের সর্বত্র তখন এক প্রগাঢ় কল্যাণের শান্ত নীরবতা বিরাজ করছিল। ধাবন্ত ট্রেনে বসে তাই দেখছিলাম তন্ময় হয়ে—অনেকক্ষণ। সহধর্মিণীর ইঙ্গিতে পিছন ফিরে হঠাৎ পশ্চিম আকাশে তাকাতেই বিচ্ছেদবিধুরা আমার প্রতিবেশিনীর ঝামরে ওঠা চোখ চোখে পড়ল।

রচনাকাল: ১৯৬৪



শার্ল বদ্‌লেয়র

ফরাসী দেশের আদালত গৃহ।

—মহান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা লেখার জন্য ও অশ্লীলতার দায়ে আপনার কবিতা সঙ্কলনটিকে অভিযুক্ত করা হলো। জানালেন পাবলিক প্রসিকিউটর।

অভিযুক্ত কবি আসামী নিরুত্তর।

আলোচনান্তে স্থির হোল, ঈশ্বর-নিন্দামূলক কবিতাগুলিকে যদিও সহ্য করা যায় চোখ কান বুঁজে, কিন্তু অন্য কবিতাগুলি অর্থাৎ অশ্লীল কবিতাগুলি নাকচ করতেই হবে।

আদালতে উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে তারপর বললেন পাবলিক প্রসিকিউটর—কবিতার নামে এই ভদ্রলোক যে জিনিষ রচনা করেছেন সেগুলিকে কোন সূত্রানুযায়ী কবিতা আখ্যা দেওয়া যায় না। কবিতা এমন এক বস্তু যা মানুষকে এক নির্মল আনন্দ জোগাবে অনন্তকাল, অথচ ইনি যে সমস্ত নারকীয় বস্তু সমূহ কবিতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলি এই নাস্তিক কবির বিকৃত মানসিকতার ফল। আর সেই জন্যই এই কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে জনসাধারণের হাতে পড়লে প্রতিটি ব্যক্তির তথা সমাজের শালীনতা বলতে কিছুই থাকবে না। উপস্থিত জুরি ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা দেখুন ভদ্রলোক কবিতার নামে কি রচনা করেছেন। তাঁর 'বৈতরণী'তে লিখছেনঃ—

হৃদয়ের কাছে এসো হিংস্র অবোধ আত্মা ভাবালসা
প্রিয়তমা বাঘিনী আমার।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমি আমার
কম্পিত আঙুলগুলোকে তোমার ঘন রোমশ কেশরে
ডুবিয়ে রাখতে চাই।

প্রতিবেশিনীর কাছে

যন্ত্রণাদীর্ণ আমার মাথাটিকে আমি রাখতে চাই
তোমার সায়ার ভিতরের সুরভিতে;
মিলিয়ে যাওয়া ফুলের মতো
হারিয়ে যাওয়া—আমার সু-স্বাদু প্রেমের
সুবাস টেনে নিতে চাই।
ঘুমোতে চাই আমি ঘুমোতে চাই
মরণের মতো নরম ঘুমে,
বাঁচতে আমি চাই না
পালিশ করা তোমার তামার মতো বরতনুকে
আমি অনুশোচনাবিহীন চুমোয় চুমোয় ছেয়ে দেব।
গুমরে উঠা কান্নাকে ভুলবো বলে,
আমি চাই কেবল তোমার অতলস্পর্শী দেহের বিছানা।
সব কিছুকে ভুলে যাবার কী শক্তিই না রয়েছে
তোমার ঠোঁটের কিনারায়,
আর তোমার চুমোয় বহমান বৈতরণী নদী।
পূর্বেই যা নির্ধারিত হয়ে গেছে—
সেই আমার অদৃষ্টকে আমি মাথা পেতে নেব
সেই আমার আনন্দ।
আত্মসমর্পিত দণ্ডিত অমায়িক আমি বিড়ম্বিত
আমার আবেগই আমার যন্ত্রণাকে শিখায়িত করে।
সমস্ত তিক্ততাকে ভুলবার জন্য টেনে নেব আমি
নেপথেন আর নীল হেমলক্
তোমার ওই সুডোল উদ্‌গত বুকের বোঁটা থেকে
—যে কখনও প্রেমকে বন্দী করেনি।

[লেখক কর্তৃক অনূদিত]

প্রতিবেশিনীর কাছে

এর পর আপনারা শুনুন আর একটি কবিতার অংশ বিশেষ—

'মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন
যেন রে ডাকিনীরা দু'জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।

[বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত]

তারপর দেখুন অন্য আর একটি কবিতার অংশ—

মোহন, পৃথুল যুগল, স্তনের বৃন্তে
ব্রোঞ্জের দুটি নিটোল মুদ্রা পড়বে ধরা,
আর উদরের সীমায় পারবে চিনতে
মখমল-কালো, বৌদ্ধের মতো স্বপ্নে ভরা,
কোমল রোমের ঐশ্বর্যের অন্ধকার
এই কেশরের সত্য সোদরা, সধর্মিণী,
কোঁকড়া, লাজুক, চপল, গভীর—তুলনা যার
শুধু অমানিশা, তারাহীন নিশা, তমস্বিনী।

[বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত]

আদালত গৃহ নিস্তব্ধ। পাবলিক প্রসিকিউটর বললেন,—তাই আমি এই অশ্লীলতম কবিতাগুলিকে বাদ দিতে চাই কবিতা সঙ্কলন হতে।

মুখ খুললেন কবি।

—অসম্ভব, বিকলাঙ্গ কবিতা সঙ্কলন কখনই প্রকাশ পেতে পারে না। আমার কবিতা সঙ্কলন এলোমেলো একটা কিছু নয়। প্রতিটি ইটের সুসংস্থাপনে যেমন স্থপতি তৈরী করে মনোময় প্রাসাদ, তেমনি আমার এই সঙ্কলন। এর থেকে একটি কবিতা বাদ দিলে আমার নির্মিত কবিতা-প্রাসাদ দুর্বল হবে। কাজেই তা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন করলেন প্রসিকিউটর—যে কবিতাগুলি সম্বন্ধে অভিযোগ

করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনার কিছু বক্তব্য আছে? যদি থাকে, আপনাকে বলবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম।

—কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেই যে আমি আপনার মতো জহ্লাদের কাছে আমার কবিতা নিয়ে ওকালতি কোরব, এ ধারণা কিভাবে হলো জানিনা; তবে আমার নির্বাক ভূমিকাকে আদালত যাতে পরম নির্বোধের মূকাবস্থা না ভাবেন তাই বলি—আপাত সৌন্দর্য ও অশ্লীলতার মাঝে আমি সৌন্দর্যের সন্ধান করি না। আমি এই পৃথিবীর নোংরামি চোলাই করে সৌন্দর্য সরবরাহ করি। তাই আমার কবিতা অনেক ক্ষেত্রে পড়তে গেলে বমি আসে—তবু তা পড়তে হয়।

ইনিই ফরাসী দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীকি কবি—শার্ল বদ্‌লেঁয়র।

ষাট বছর বয়সে বিপত্নীক অবস্থায় একজন মাতাপিতৃহীনাকে বিবাহ করেন তার পিতা। দু'বছর পর তাদের একমাত্র সন্তান শার্ল ১৮২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভূমিষ্ঠ হন। অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে শার্লের বয়স যখন মাত্র ছ'বছর তখন তার পিতা মারা যান। তাঁর মা পুনরায় একজন সৈন্যকে বিবাহ করেন। উত্তরকালে কবি বদ্‌লেয়রের অশান্তিময়তার যে অস্থিরপনা লক্ষ্য করা যায় তা নাকি তাঁর মায়ের পুনর্বিবাহের ফল। পৃথিবীর সর্বত্র যে সম্মানীয় আসন পাকা রয়েছে সেই আসন থেকে বদ্‌লেয়র 'দি রোপ' গল্পে মাকে টেনে এনে নামিয়ে দিয়েছেন একেবারে অবমাননার শেষ পৈঁঠায়। অথচ শার্লের বি পিতা তাকে স্নেহ বৈ তিরস্কার করতেন না।

লেখাপড়ায় স্কুলে কোন পারদর্শিতা না দেখিয়েও তিনি বালক বয়সে লাতিন ভাষায় কবিতা লিখে একটা প্রাইজ পেয়ে যান। স্কুল ছেড়ে দিলেন, অথচ পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পড়াশোনায় মনোনিবেশের ভান করে গোপনে লেখা অভ্যাস করলেন। কিন্তু চাপা রইল না খবরটা। তার বাবা তখন তার এই বদ অভ্যাস (?)

ত্যাগ করাবার জন্য পূর্বগামী এক জাহাজে ভারতের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। অনেক দিনের পথ, কিন্তু বেশী দূর যেতে হলো না। রিয়্যুনিয়ন হয়ে মরিসসের পথে প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজটিকে সারাবার প্রয়োজন দেখা গেল। শার্ল ইতিমধ্যে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন সহযাত্রীদের উপর। মরিসসে তিনি নেমে পড়লেন। আলাপ করে নিলেন সেখানকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে। অবশেষে আশ্রয়দাতার স্ত্রীর প্রেমে পড়লেন। বিশেষ করে এই ভ্রমণের ফলেই তিনি কবি হলেন পুরোপুরি। কাব্যে গৃহমুখীনতার সুর লাগলো। কিছুদিন কাটিয়ে তারপর তিনি এলেন ফ্রান্সে। বাবার উইল অনুযায়ী প্রাপ্ত-বয়স্ক হ'য়ে মালিক হলেন সম্পত্তির। এই সময়ে তাঁর রচনায় ভয়াবহতার প্রতি, অমরতার প্রতি অস্বাভাবিক প্রীতি দেখা গেল। লিখতে লাগলেন প্রচুর। ঈশ্বর নিন্দায় মুখর বদ্‌লেয়র কবিতার অক্ষরে অক্ষরে যেন গরল উগরে দিলেন। অনেক দিন হতেই তিনি বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত নিগ্রো নায়িকা জেনি দ্যুভালের সঙ্গে কাটাচ্ছিলেন। চূড়ান্ত রকমের খামখেয়ালী আর পাগলামিপনার জন্য তিনি শ্রদ্ধান্বিত-ভাবে খ্যাত হতে লাগলেন কিছুদিনের মধ্যেই। কবি বদ্‌লেয়রের জীবনে এমন নিশ্চিন্ত সুখের সময় আর কখনও আসেনি বললেই চলে। এই সময়ে এমিল ডি'রয়ের আকা কবির প্রতিকৃতির দিকে তাকালেই তাঁর সেই ভাবনাবিহীন মনের অভিব্যক্তিটুকু বোঝা যাবে। একমাথা কোমল চুলের অবিন্যস্ততায়, ওষ্ঠাধরের প্রসন্নতায়, অবিকৃত মুখাবয়বের সৌকর্যে এমন কী বসবার বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় সমস্ত মিলে তিনি যেন পরম তৃপ্ত হ'য়ে কোন স্বপ্নের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বুঁদ হয়ে বসে আছেন। এই প্রতিকৃতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা তাঁর পরবর্তী জীবনের ভয়াবহ প্রতিকৃতির কথা চিন্তা করতেই পারেন না। দেখে চেনা তো সম্ভব নয়। বললেও বিশ্বাস করতে মন সরে না।

যাই হোক নবলব্ধ অর্থের অকুণ্ঠ অপচয়ে তিনি এমনই ব্রতী

হলেন যার ফলে কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেল। আইনজীবী নিযুক্ত হলো সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্য। মাসান্তে বাকী সম্পত্তির সুদ ছাড়া তাঁকে কিছু দেওয়া হত না। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই বরাদ্দের উপর নির্ভর করে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল। এরপর বিরাট পরিবর্তন এল তাঁর জীবনে অস্বাভাবিক তৎপরতায়। চেহারাতেও লক্ষণীয় পরিবর্তন লক্ষিত হলো। ঝলমলে দামী পোষাক পরিত্যাগ করলেন। অত্যন্ত সাধারণ ধরনের কাট-ছাঁটের পোষাক পরে ঘুরে বেড়াতেন। সারা মুখটায় কালো গভীর দাগে ভর্তি হয়ে গেল। কেউ যেন ধারালো একটা ক্ষুর দিয়ে চিরে ফালা ফালা করে দিয়েছে। রচনাতেও নৈরাশ্য ধ্বনিত হলো। লেখাকে এখন থেকে পেশা বলে গ্রহণ করলেন কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জনের চেষ্টায়। তাঁর বিখ্যাত নন্দনতত্ত্বের সন্দর্ভগুলি প্রকাশিত হলো। সময়—১৮৪৬। দুঃখের হ্রদে অবগাহন ক'রে মনে এল সংগ্রামী ও বিপ্লবী চেতনা। ১৮৪৮ এর বিপ্লবে সামান্য অংশ গ্রহন করলেন সাময়িকভাবে। আলাপ হোল চিত্রশিল্পী কুঁরবের সঙ্গে। নতুন নগর-চেতনায় উদীপ্ত হয়ে কবিতা লিখলেন; পরে বিরক্ত আর হতাশ হ'য়ে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো সংগ্রামী ভূমিকা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তারপর দুশ্চিকিৎস্য যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন।

জর্মন দার্শনিক সুডেনবর্গ এবং আলানপোর লেখা পড়ে প্রেরণা পেলেন প্রভূত। অনেক কবিতা আর প্রবন্ধ লিখলেন। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ না করলেও এডগার পোর রচনার সার্থক অনুবাদক হিসেবে তিনি ফরাসী সাহিত্যে চিরজীবী হয়ে থাকতেন, একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে রাখীবন্ধন হলো প্রবন্ধের। কবি বদ্‌লেয়রের ধারণায়—শিল্প অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না শিল্পী হন একজন সুধী বিচারক। শাশ্বত সৌন্দর্য ও

সত্যের সন্ধান দার্শনিক-কবি ছাড়া কেউ পেতে পারেন না। খুব জোর ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রবণ একজন রোমান্টিক কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করতে পারেন। নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে শব্দে ধ্বনিতে ছন্দে আর রূপকে যিনি অনুবাদ করতে পারেন তিনিই কবি। সমালোচকও তাই করেন, তবে অন্যভাবে—অনুধ্যানের স্ফটিক ঔজ্জ্বল্যে যা রূপ পেয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে। সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি তাই কবি বদ্‌লেয়রের কবিতার ভাঁড়ার ঘরের চাবি কাঠি। তিনি বিশ্বাস করতেন —পার্থিব বস্তুসম্ভার কেবলমাত্র অধরা বিষয়ের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ। কী এক অস্পষ্ট ভাষায় পৃথিবীর বস্তুনিচয় যেন অপেক্ষমান সেই সার্থক শিল্পীর আশায়, যিনি এসে উদ্ধার করে নেবেন তার (পার্থিব বস্তুর) অনুচ্চারিত এবং স্বল্পোচ্চারিত গাথাকে বাঙ্ময়তার অকুণ্ঠ প্রকাশের কৌলীন্যে। শিল্পই প্রকৃষ্টতম এবং একক মাধ্যম যার সাহায্যে সৌন্দর্য ধরা পড়ে, সাড়া দেয়। আর সমস্ত সৌন্দর্যই আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত হয়। তাঁর ধারণায় সুন্দর বলে কোন জিনিষের অস্তিত্ব নেই। শিল্পী সৌন্দর্য আরোপ করেন তাই চুনি রাঙা হয়ে, ওঠে পান্না সবুজের আভায় টলমল করে। সৌন্দর্য যেন আগুনের বিকিরিত শিখা। আর সেই অগ্নি উৎপন্ন হয় আধ্যাত্মিক চেতনার আঘাতে। যে কবি যত আধ্যাত্মিকতায় দৃপ্ত সে কবি ততই এই সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পান।

সঙ্গীত, স্থাপত্য, কবিতা, চিত্রকলা—যাবতীয় শিল্পসম্ভারে এক একটি বিশেষ দর্শন নিজস্ব অস্পষ্ট আলোর বিভাসে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্পসম্ভূত বিষয়ের বোধগম্যতা কোন নির্দিষ্ট ভূগোলে ধরা দেয় না। রঙে রেখায় যে চিত্র নয়নকে মুগ্ধ করে কানেও তার ধ্বনি এসে লাগে, অবশেষে হৃদয়ের দরজায় এসে সে ধরা দেয়। একটি শিল্পের মধ্যেই যাবতীয় শিল্পকে প্রতিফলিত করা যায়। রূপ রস সর্বদাই স্থান হতে স্থানান্তরে পিছলে উপছে পড়ছে—অনবরত। রঙের সুষমা শব্দে, শব্দের মাধুর্য রঙে রূপান্তরিত হয়। মহৎ শিল্পের এটি একটি বিশেষ

লক্ষণ। নমুনা হিসেবে নিচে তাঁর 'বিদেশী সুরভি' নামক অপূর্ব কবিতাটি উপস্থিত করছি।

শরতের কোন এক নিবিড় সন্ধ্যায় চোখ দুটিকে বুঁজে
যখন আমি তোমার তপ্ত বুকের সুঘ্রান টেনে নি
তখনই দেখতে পাই চিরকালীন সূর্যের ঝকঝকে আলোয়
সুখী সৈকত উন্মোচন করছে নিজেকে।

প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছে অলস সেই দ্বীপটিতে
আশ্চর্য যত তরুশ্রেণী আর সুগন্ধি যত ফল
রেখেছে বীর্যবান কৃশতনু মানুষদের
অবাক সারল্য-ভরা-আঁখি কন্যাদের।

তোমার সুগন্ধে বুঁদ হয়ে মোহিনী মায়ার দেশে
হাজির হয়ে—দেখি আমি
পাল মাস্তুলে বোঝাই
সমুদ্র-ঢেউ-ক্লান্ত এক বন্দরকে।

আর শ্যামল তেঁতুল বীথির সুরভি যখন
বাতাসকে আমোদিত করে তুলে
ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আমার ভরপুর করে দেয়
তখন তা যেন আমার আত্মার কাছে
মাল্লাদের গান হ'য়ে মিশে যায়।　　[লেখক কর্তৃক অনূদিত]

লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে উপরের বক্তব্যের সত্যতা। সামান্য কোনো বিদেশী সুরভির আঘ্রাণে কবির নিমীল নয়নে ভেসে উঠল সেই দ্বীপের দৃশ্য। দেখতে পেলেন সেখানকার গাছগাছালি, বাসিন্দাদের, বন্দর, পাল-মাস্তুল-খাটানো জাহাজগুলো, তার মাল্লাদের। তারপর

যেন শুনতে পেলেন তাঁদের গান যা আত্মার কাছে পৌঁছায়। গন্ধ নিয়ে এল দৃশ্যে, দৃশ্য—শব্দে, শব্দ—গানে, গান—আত্মায়। এই যে আস্বাদন, এতো শুধুমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নয়, নয় কর্ণের, নয় চক্ষের অথচ কাউকে বাদ দিয়েও নয়। সব যেন সক্রিয় হয়ে উঠে কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করে উপভোগ করে।

এই সত্যে বিশ্বাসী হয়ে বদ্‌লেয়র মেতে উঠলেন কবিতা রচনায়। চূড়ান্ত শিল্পজনোচিত বৈগুণ্যের বিশুদ্ধি দেখা গেল তাঁর রচনায়। বক্তব্য ভিন্নমুখী হলো। তপ্ত কামানুরাগ ও তীব্র মানসিকতার ছাপ কবিতায় কমে গেলো। স্নিগ্ধ সুষমায় তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি স্মরণীয় হয়ে রইলো।

'ল্য ফ্লর দ্‌'ম্যল' বের হলো ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরনিন্দা ও অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে বাজেয়াপ্ত হলো। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন ১৮৬১ তে। কবি এই সঙ্কলনের সাফল্যে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু আদৃত না হওয়ায় প্রচণ্ড আহত হলেন। নিজের প্রতিভার প্রতি সংশয় জাগলো। শরীর ভেঙ্গে পড়লো। প্রকাশক পউলেট মালাসিস দেউলিয়া হয়ে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পাওনাদারদের ভয়ে বেলজিয়মে পালালেন। বইগুলি অবিক্রীত রইলো—নামমাত্র কাগজের দামে পরে বিক্রী করে দিতে হলো।

১৮৬৪ তে বদ্‌লেয়র এলেন বেলজিয়মে বক্তৃতার মারফৎ কিছু উপার্জনের আশায় ব্রুসেলসে তখন ফরাসী সাহিত্যিকদের আড্ডা। তাঁর বক্তৃতাও কোন কাজে এল না—রচনাদিও উপযুক্ত সম্মান পেল না। বেলজিয়ম আর ফ্রান্স একাকার হয়ে গেল। আত্ম-সম্মানের প্রবল আভিজাত্যের দম্ভ ফরাসী দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে হিমালয় হয়ে বাধা দিল। ঠিক করলেন যতদিন না অবস্থার উন্নতি হয়, ফিরবেন না ফ্রান্সে। ফিরতে যদি হয় তো বিজয়ী সম্রাটের মতো ফিরবেন।

ব্রুসেলসে থেকেই তিনি যোগাযোগ করলেন তার বইয়ের নব্য সংস্করণের জন্য প্রকাশকদের সঙ্গে। অবশেষে এক প্রকাশনীর সঙ্গে সর্তাধীন হবার পুর্বেই পক্ষাঘাতে পঙ্গু হলেন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সামান্য বল পাওয়া মাত্র তাঁকে প্যারীতে আনা হোল। কিন্তু তিনি আর কোন দিনই বাক্‌শক্তি ফিরে পেলেন না। অনেকের ধারণা শেষদিন পর্যন্ত তাঁর প্রখর বুদ্ধিদৃপ্ত মনের চিন্তাক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় ছিল।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৩১ শে আগষ্ট শান্তিপূর্ণভাবে তিনি তাঁর জীবন শেষ করলেন। তখন গ্রীষ্মোপলক্ষে সারা প্যারী শহর প্রায় শূন্য। কয়েক জন মাত্র লোক তাঁর শবানুগমন করেন। মণ্টপার্‌নেসে তিনি বি পিতার সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ হন।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও কেউ এলেন না বললেই চলে। 'ফ্ল্যর দ্যু'ম্যল' যাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন সেই গঁতিয়ের পর্যন্ত রইলেন অনুপস্থিত। যে অনাদর আর অবজ্ঞা জীবদ্দশায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনে নিত্য সহচর ছিল তারাই এল শেষ পর্যন্ত শববাহকদের সঙ্গে সঙ্গে। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন তাঁর দুইবন্ধু। একজন মাত্র যুবক কবি বদ্‌লেয়রের মৃত্যুতে অমেয় ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করে ব্যথিত হয়েছিলেন—পল ভেরলেন, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কবির জীবদ্দশায় মূল্য-নিরূপক যথার্থ সমালোচনা করে তাঁর কাব্যের প্রশংসা করেছিলেন।

যাই হোক, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলী শীঘ্রই নীলামে চড়ানো হলো। লেভী মাত্র সত্তর পাউণ্ডের বিনিময়ে স্বত্বাধিকারী হলেন।

অনেকদিন পর তাঁর কবিতার মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন সাহিত্যিক মহল। নিজেদের মূঢ়তার কথা স্মরণ করে লজ্জায় অধোমুখ হলেন। তাঁর রচনার অমূল্য সম্পদ থেকে, তাঁর জীবন থেকে প্রেরণা পেলেন কত জন। নতুন কাব্য ভঙ্গিমা ও

বক্তব্যের স্রোতের ভগীরথ হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন। অবভাষণে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁরাই অনুকীর্তনে পঞ্চমুখ হয়েছেন। কালের কষ্টি পাথরের বুকে গভীর উজ্জ্বল রেখার সন্ধান পেয়ে অবাক হয়ে গেছেন দলবেঁধে সবাই। পৃথিবীতে সৌভাগ্যবান খুব কম শিল্পীই আছেন যাঁরা তাঁদের নিজেদের গৌরবের আলোয় স্নান করে গেছেন।

বদ্‌লেয়র—সমসাময়িক কালের ধারণায় তিনি ছিলেন বেশভূষা-প্রিয় লম্পট, আফিম আর ভাংখোর ঈশ্বরবিদ্বেষী এক চূড়ান্ত শয়তান—যার কাজই হচ্ছে শয়তানী আর নোংরামি ছড়ানো—সমাজের মধ্যে।

বদ্‌লয়ের নাম উচ্চারণ করলে যে ছবি মনে ভেসে ওঠে সে ছবি ডি'রয়ের আঁকা প্রসন্ন প্রতিকৃতিখানির নয়; নিজের আঁকা তাঁর নিজের প্রতিকৃতির। কী ভয়াবহ সে ছবি। ক্রূর অবিশ্বাসী চোখের তারায় সে কী অসহায়তা—তাকাতে পারা যায় না। রুগ্ন মুখমণ্ডলে, কেশের স্বল্পতায় ওষ্ঠাধরের বিরক্তিপূর্ণ গাম্ভীর্যে নির্মম ভাগ্যবিপর্যয়ের বেদনা যেন চাপ বেঁধে আছে রোষে—ঘৃণায়। ফরাসী দেশের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন লম্বা এক কালো কোট পরে, মাথায় লম্বা টুপি আর মুখে লম্বা এক চুরোট নিয়ে, শহরের সমস্ত অভিজাত টাওয়ারের উচ্চতা ও সূর্যকে অনেক নিচে রেখে; সুঠাম উন্নতিতে মূর্তিমান সন্দেহের একক প্রতিনিধি অন্ধকার ধোঁয়ায় ঠাঁসা জাহন্নামের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে যেন বাঁকা চোখে সব কিছুর দিকে ব্যঙ্গভরে তাকিয়ে দেখতেন।

১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ দেখল বিশ্বমৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ সবই অর্থহীন ভাঁওতায় ভরা। এরপর থেকে কবি বদ্‌লয়রকে নিয়ে মাথায় তুলে মাতামাতি আরম্ভ হলো। সাম্প্রতিক কালের সবচেয়ে ধুরন্ধর কবি বলে আদৃত হলেন। এতদিন পর আবিষ্কার করা হলো যে, তিনি চিন্তা করে গেছেন রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি হাজারো

চেতনার সোজা সড়ক ও অনাবিষ্কৃত গলি ঘুঁচি পরিক্রমণ করে। বদ্‌লয়ের বলতেন—সুখ সম্ভোগ প্রগতি মানুষের শয়তানি বুদ্ধি-হ্রাসের ওপর নির্ভর করে উন্নতি লাভ করে।

এতদিন যে দিকে মোটেই দৃকপাত করার দরকার হয়নি তাঁর রচনার সেই আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে গোঁড়া খৃশ্চানরা তাঁকে তাঁদের প্রিয় কবি হিসেবে দলে টেনে রটনা করলেন যে তিনি একজন মারাত্মক রকমের ক্যাথলিক ছিলেন। এবং এই রটনা যাতে প্রসারিত হয় সেজন্য তাঁর ঈশ্বরনিন্দামূলক অনেক কবিতা বাদ দিয়ে, কিছু রেখে তার অপব্যাখ্যা করে ছাড়লেন। ধারাবাহিকভাবে দেখলে হয়ত দেখা যাবে যে শেষভাগে তিনি ঈশ্বর নিন্দায় অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে দুর্দান্ত যৌবন আর প্রৌঢ় সময়ের মধ্যবর্তী রাজ্যে দাঁড়িয়ে যিনি ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র ও তাঁর মোক্ষলাভকে স্বীকার করা দূরের কথা, উপহাস আর কৃপা আর নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন। তিনি যে পয়লা নম্বরের একজন ক্যাথলিক এ ধারণা কিভাবে আসে বোঝা দুষ্কর। তাই মনে হয় যে সব অসহায় ধর্মান্ধরা জীবিতকালে নীতির যূপকাষ্ঠে ফেলে তাঁর মতো প্রতিভাবান কবিকে বলি দিতে পারেন নি, মৃত্যুর পর যেন তাঁদেরই বংশধররা সেই আশা মিটিয়ে শান্তি পাচ্ছেন—মনে মনে। প্রতিশোধ নেবার নতুনতর হিংস্র অহিংস ভঙ্গি দেখে অবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

অনেক দিন গত হয়েছে। ফরাসী দেশের বিখ্যাত কবি শার্ল বদ্‌লয়ের আজ মহান প্রেমের কবিতা লিখিয়েদের মধ্যে অন্যতম কবি হিসেবেই শুধু নয়, শতমুখিন চিন্তায় চিন্তিত একজন সুধী হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করেছেন। প্রশংসার ময়ুর-সিংহাসনে তাঁকে বসানো হয়েছে। কিন্তু যে বেদনা নিয়ে তিনি বিদায় নিয়েছেন তা তো শত শত মূঢ়ের অনুতাপে সংশোধিত হবে না। আমরাও আর সেই ঝলমলে পোষাক পরা কবিকে চোখের সামনে দেখব মনে

করলেও দেখতে পাব না ; যাকে দেখা যাবে স্মরণের পর্দায় তিনি তো মাতাল এক কবি—সারা জীবন মাতালের মতো যিনি টলমল করেছেন ভাবের ঘোরে, সূক্ষ্ম চৈতন্যের অধীশ্বর—যিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার তথাকথিত স্থুল ঐশ্বর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘৃণায় লম্বা চুরোট মুখে পথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সর্বোপরি বদ্‌লয়ের মাতাল ছিলেন—এই তাঁর পরিচয় হোক। তিনি বিধান দিয়েছিলেন—

সব সময় মাতাল হতে হবে। ওতেই সব :
ঐ একমাত্র বিবেচ্য।
যদি বোধ করতে না চাও মহাকালের ভয়ানক ভার,
যাতে তোমার ঘাড় ভেঙ্গে যায়
আর তুমি বেঁকে পড়ো মাটির দিকে,
তবে তোমাকে মাতাল হতে হবে—অবিরাম
কিন্তু কিসে ?
মদে, কবিতায়, সৎকার্যে, তোমার যা রুচি।
কিন্তু মাতাল হও। [বিষ্ণু দে:কর্তৃক অনূদিত]

এই বিধান যিনি দিতে পারেন তিনি এমন কিছু করে যান, যা থেকে উত্তর কালের বংশধররা আলো পায়। এ এক শাশ্বত কথা : মাতাল হও, কিংবা : পাগল হও। সব সাধকরা এই এক কথাই বলেন। নিজের সাধন ক্ষেত্রে বসে ফরাসী কবি বলেন : মাতাল হও। আর বাংলায় বসে সাধক বলেন : দাও মা আমায় পাগল করে। পাগলই মাতাল, মাতালই পাগল। জীবিতকালে চিরকালই এঁরা উপেক্ষিত হন। এই দুর্লঙ্ঘ্য বিধির কী পরিবর্তন হবে না ?

[রচনাটির পবিত্রতা রক্ষার জন্য FALCON PRESS-এর SELECTED POEMS : Charles Baudelaire-এর উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে।]

রচনাকাল : ১৯৫৬

তালা

পৃথিবীতে এত যে যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তির ঝড়-ঝাপ্‌টা তার মূলে যে বস্তুটি তাকে চেনেন আপনারা সকলে। সেটি হচ্ছে তালা। প্রথমে ত বাক হলেও চিন্তার গভীরে ডুব দিয়ে চোখ বুঁজে দেখুন—দেখবেন আর বলবেন—সত্যিই তো, তালাই তো এত সমস্ত তাল-গোলের প্রধান কারণ। তালার সাহায্যেই সামান্য সম্পত্তি থেকে আরম্ভ করে বৃহত্তর সম্পত্তি—সবই থরে বিথরে সাজানো থাকছে; ভারী লোহার সিন্দুক থেকে আপনার আমার হাত বাক্সের ভৈতর। তালা দেওয়া না থাকলে কোনো জিনিষের মূল্যই বাড়ে না।

মাঝ রাতে ঘরে চোর ঢুকেই প্রথমে এগিয়ে যাবে আপনার তালা দেওয়া বাক্সের কাছে—ভিতরে কিছু না থাকলেও তার আপত্তি নেই—বাক্স নিয়ে চোঁ চোঁ দৌড় দেবে—দিয়ে তালা ভেঙ্গে দেখবে কোনো পুকুরের পাড়ের গা ছম্‌ ছম্‌ আঁধারে। কিছু পাবে না—ফেলে চলে যাবে গালমন্দ দিতে দিতে, তবু আপনার বিয়েতে পাওয়া সোনার বোতাম লাগানো পাঞ্জাবীটা তুলে নেবে না। কারণ সেটা তালা বন্ধ ছিল না, খোলামেলা জায়গায় হ্যাঙারে ঝোলানো ছিল। এখানেই তালার জিৎ।

প্রাচীনকালে পৃথিবীর আদিম অবস্থায় ঠিক তালা না থাকলেও তালার পূর্বপুরুষরা ছিল। নিজের সঙ্গিনী এবং আহৃত খাদ্যদ্রব্যকে অপরের নজর বাঁচিয়ে নিরাপদে গুহার ভিতরে রেখে গুহামুখে এক খানা জগদ্দল পাথর চাপা দিয়ে দেওয়া হত। তখনকার কালে ঐ পাথরের চাঁইটাই ছিল কপাটকে কপাট, তালাকে তালা। তারপর নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে বহু যুগ অতিক্রান্ত হয়ে আজকের সুদৃশ্য ছোট্ট অথচ মজবুত তালায় পরিণত হয়েছে।

প্রতিবেশিনীর কাছে

আজকে যেমন তালা খোলবার চাবি আছে বহুকাল আগে তেমনি চাবি ছিল কি না কে জানে ? আলিবাবার সময়ের লোকেরা মন্ত্র দিয়ে দরজা খুলত—একথা আমরা জানি। যতই দিন যাচ্ছে ততই হরেক রকমের তালা বের হচ্ছে। এক তোলা থেকে এক সের—কত রকমের কত ধরণের। আর নাম কত তাদের—মাষ্টার লক্, গা-তালা, টেপা-তালা, কম্বিনেশন লক্ ; শুনতে শুনতে কানে আপনার তালা লেগে যাবে।

ছোট্ট 'তালা' কিন্তু তার প্রতাপ কী অসীম। আপনার প্রতাপ কত এবং কী ধরণের এক নিমেষে আমি বলে দিতে পারি অবশ্য যদি জানতে পারি ক'টা এবং কী ধরণের তালা আপনার বাড়ীতে আছে। যে যত তালেবর ব্যক্তি তার বাড়ীতে তত তালা—এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই। সাধু সন্ন্যাসীদের আস্তানায় তালা নেই, অতএব তাঁদের নেইও কিছু। আপনার আমার ঘরে দুটো বড়, তিনটে মেজ, গোটাচারেক ছোট তালা আছে—তার দ্বারা বোঝায় সামান্য কিছু আছে আমাদের যা তালা দিয়ে আটকে রাখতে হয়। আবার আপনি যদি চাকুরে হন তো আপনার বড়বাবুর বাড়ীতে খোঁজ করুন, দেখবেন, পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁর বাড়ীতে তালা কত বেশী। আবার তাঁর বাড়ীর সমস্ত তালার চেয়ে কোন বড় দোকানে, রাত্রে বন্ধ অবস্থায় তাকিয়ে দেখুন কিংবা দেখুন সোনা-জহরতের পটিগুলো ঘুরে অথবা ব্যাঙ্কের সামনে, তখন আপনি বুঝতে পারবেন ক্রমশ তালার মাহাত্ম্য। এ যুগকে পরিচালনা করছে তালারা। এর সম্পত্তি ও কেড়ে নিয়ে বিক্রী করে নিজের বাক্সে তালা বন্ধ করছে। কালোবাজারীরা মওকা বুঝে গুদামকে গুদাম তালাবন্ধ করে রেখে মালের দর চড়াচ্ছে—লাখ লাখ টাকা কারবারে চলে আসছে। তার ফলে তাল তাল সোনা তালাবন্ধ হচ্ছে ভারী সিন্দুকে, লকারের গোপন অন্ধকারে।

প্রতিবেশিনীর কাছে

আলমারির তালা খুলে ধড়িবাজ চোরেরা সোনাদানা নিয়ে পালিয়ে যায়—আমরা সকলে শুনে তাজ্জব হই—বলেন কি ? তালা খুলেছে আবার লাগিয়েছে ! বেটা জিনিষপত্র সরিয়েছে অথচ আমরা সেই ঘরের পাশে শুয়ে টের পাইনি—বুঝুন ব্যাপার। এতবড় বিস্ময়কর ব্যাপারের কেন্দ্র হচ্ছে সেই তালা। এই তালা খোলাখুলি, 'রোহিনীর' সেই জাল উইল রাখা-ঢাকা মনে আছে তো ? অতবড় বইটার মূল ব্যাপারটা কোথায়—সেটা সেই তালা খোলাতেই তালাবন্ধ নয় কি ?

আমাদের সমাজে যেদিন থেকে তালা এসেছে সেদিন থেকেই আমাদের দুঃখ-কষ্টের শুরু হয়েছে। কেমন একটা পর পর ভাব এসেছে সবার মধ্যে। এটা আমার, ওটা তোমার। যদি এমন হয়, সমস্ত তালাদের প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ফেলে দেওয়া হল—পৃথিবীতে যত তালা আছে—তারপর সব খোলা রইল। তখন যা দরকার লোকে তাই নেবে—বেশী নেবে না—কারণ নিয়ে লাভ কী, বন্ধ করে রাখবে কিসের জোরে ? তালাই নেই। কী অপরূপ হয় বলুন দেখি ! শুধু সম্পত্তি দ্রব্যসামগ্রীই নয়, মানুষের যে মন আজ লাখো তালার জটিল লিভারের প্যাঁচে আবদ্ধ সেও মুক্তি পাবে। তখন আর পৃথিবীতে কোনও বিশেষ শিবির থাকবে না। কারণ তালা নেই—আর তালা নেই বলে বাজার দখল করার সমস্যা নেই, দখলের সমস্যা নেই বলে যুদ্ধ নেই আর এ সমস্ত নেই বলেই আছে এক শান্তিময়ী রূপবতী কান্তিময়ী পৃথিবী। সে দিন আসবে কবে ?

রচনাকাল : ১৯৫৮

আধুনিক বাংলা কবিতা

ঠিক বর্তমান মুহূর্তে বাংলাদেশে কাব্যচর্চা কতটা হচ্ছে, কী ধরণের হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্যে হচ্ছে এ সব আলোচনার পূর্বে দেখে নিতে মন যাচ্ছে আধুনিক কবিতা-লিখিয়েদের কর্মতৎপরতাকে, যে কর্মতৎপরতার সঙ্গে বিজড়িত কাব্য-আন্দোলন প্রয়াস।

'কাব্য-আন্দোলন' কথাটি সাহিত্যক্ষেত্রে দোসরহীন। কারণ গল্প-আন্দোলন, চিত্র-আন্দোলন, সঙ্গীত-আন্দোলন, উপন্যাস-আন্দোলন বলে কোন শব্দিত প্রয়াস কানে আসে না। বরং গল্প-উপন্যাস-সঙ্গীত-চিত্র প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা কথাগুলি শোনা যায়। সে জন্যেই মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, 'কাব্য-আন্দোলন' কথাটার পিছনে নিশ্চিত কোন তুমুল গাঢ় সমাচার অপেক্ষা করে আছে।

সাধারণত 'আন্দোলন' কথাটা শুনলেই খাদ্য-আন্দোলন, গণ-আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। যেখানে কোন অভাব থাকে, নিত্য ভোগ্য দ্রব্যের অপরিমিত সরবরাহ থাকে, অধিকারগত পাওনাগণ্ডার ঘাটতি থাকে সেখানে গড়ে ওঠে সুসংবদ্ধ আন্দোলন। বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে আলোড়িত একটা কম্পনকে জনসাধারণের মধ্যে চেতনা সঞ্চারণের জন্যে প্রচার করা হয় ও বিক্ষোভ প্রকাশের দ্বারা সেটা তীব্রতর করে তোলা হয়। কবিরা প্রধানত খুব অনুভূতিপ্রবণ, অভিমানী ও লাজুক প্রকৃতির হয়—এ রকম একটা কথা চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা মনে হয় না। বরং দর্পিত প্রচার-সর্বস্বতার যূপকাষ্ঠে তাঁরা দলবদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন—মেনে না নিয়ে উপায় নেই। বাংলা দেশে কবিতা বিষয়ে এখন প্রবল উৎসাহ (কবিদের মধ্যে)। সংখ্যাতীত 'লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন' পাড়ায় পাড়ায় অপ্রতিহত ভাবে গজিয়ে উঠছে, কবি সম্মেলনেরও অন্ত নেই, কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা

নিত্য বর্ধমান—এই সমস্ত তথ্যকে একত্রিত করলে যে উদ্দীপনার সূত্রপাত হয়, তারই পক্ষকালব্যাপী প্রতীক হলো 'দৈনিক কবিতা'। এতে কবিতাচর্চার বদলে কবিকুলের পারস্পরিক গুঁতোগুঁতির মাধ্যমে মঞ্চ অধিকারের চেহারাটাই প্রকট হয়ে ধরা পড়ছে। 'সম-সাময়িক কালের কাছে করুণ আত্মসমর্পণ অনেক কবিরই করুণ নিয়তি। নির্বোধ গৌরবে অনেকেই মনে করেন এই সমর্পণের ভিতর দিয়ে তাঁরা গত যুগকে অস্বীকার করছেন, নতুন যুগের সৃষ্টি করছেন, সাহিত্যের প্রবহমানতাকে অব্যাহত রাখছেন। প্রথমত গত যুগকে অস্বীকার করা না করা, নতুন যুগের সৃষ্টি অথবা সাহিত্যের প্রবহমান-তাকে অব্যাহত রাখা ইত্যাদি কোনটাই কোনো কবির দায়িত্ব নয়। একজন কবির কাজ কবিতা লেখাই। তা'ছাড়া এই রকম আত্মসমর্পণ তাঁদের ভিতরের অন্বেষণকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে যে তাঁরা বুঝতেই পারেন না এক রীতিকে অস্বীকার ক'রে তাঁরা শেষ পর্যন্ত অপর শৃঙ্খলের স্বতঃস্ফূর্ত দাসত্ব মেনে নিয়েছেন'—কবি আলোক সরকারের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

নিজ নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত থাকার প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। একথা মেনে নিতে কোন বাধাই নেই যে কবিতা রচনার পাশাপাশি সমালোচনা, বিতর্কাদি না থাকলে একটা উত্তাপ অনুভব করা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে কবিতা প্রকাশ নিয়ে যে চাপল্য, খামখেয়ালীপনা চলেছে তা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি চোখ-ধাঁধানো হঠাৎ-আলোর-ঝলকানির মাঝে নিজে-দেরকে হাজির করতে চাইছেন। তাঁরা ধরেই নিয়েছেন বাংলা দেশ মানে কলকাতার খানিকটা অঞ্চল, কবিতাপাঠক ও সমালোচক মানে প্রধানত তিনি এবং তার কিছু শিষ্য ও তাঁর দু'চারজন কবিতা-লিখিয়ে বন্ধু। অর্থাৎ সমগ্র ব্যাপারটাকে তাঁরা একটা পারিবারিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তাই যদি হয় তা হলে 'কাব্য-আন্দোলন' শব্দটি

একটি সংকীর্ণ ভূগোলের মধ্যে বন্দী-দশা প্রাপ্ত হয়। কে আর না চায় যে তাঁর রচনাটি প্রকাশিত হয়ে আলোড়িত .কলরবের মধ্যে মর্যাদা লাভ করুক, ব্যাপ্ত হয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মানস সরোবরে একটা কম্পন সৃষ্টি করুক। এই চাওয়াটা কখনও মিনতির মাধ্যমে কখনও ইচ্ছার মৃদু আভাসে ঘোষিত হয়। তবে এখন মিনতি বা আভাসের কোনো বালাই নেই। আধুনিক কবিকুল সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে নেমে পড়েছেন নগদ বিদায়ের কিস্তি আদায় করতে—তা সে খিস্তি-খেউড় করেই হোক, আঙ্গিকের ওলট-পালট, শব্দের ঘাড় মটকে শব্দনির্ঘাস বের করেই হোক। কিছুতেই কিছু এসে যায় না এঁদের। বর্ষীয়ান কবিরা কনীয়ান্ কবিদের ছন্দ নিয়ে আপত্তি তুললে এঁরা উৎসাহিত হন এই ভেবে যে তাঁদের সৃষ্ট বিস্ফোরণকারী ছন্দের দিকে ওঁদের দৃষ্টি পড়েছে। এবং তাঁরা ভেবে নেন যে বর্ষীয়ান কবিরা দেউলে হয়ে গেছেন ও তাঁদের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-মার্কা যে অভিভাবকত্ব ছিল তাতে চিড় ধরেছে বলেই তাঁরা ওজর-আপত্তির কথা তোলেন। অবশ্য প্রবীণ কবিদের বেশীর ভাগ নিস্পৃহ থেকে বুদ্ধিমানের (?) ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর অনেক মধ্যমস্তরের পরিশ্রম-বিমুখ কবিতালেখক দলীয় অস্তিত্ব প্রসারকল্পে প্রকৃত বুদ্ধিম'.নর (?) মতো যে যা লেখেন তাকেই অভিনন্দিত করে কবি-কর্মী সংগ্রহ করেন। এঁরা নিজ নিজ কবিতা-অনুশীলন- পরিধিতে দাঁড়িয়ে এবং নিজেদের অশক্ত অবস্থার কথা বিবেচনা করে নিরাপত্তার জন্য অনুজ-প্রতিমদের স্তাবকতার ভার দিয়ে নিজেদের পাশে দাঁড়াবার কোনমতে একটু ব্যবস্থা করে দেন। নতুন কবিগোষ্ঠীর অনেকে কোন স্থান না পেলে গুঁতোগুঁতি করে একে অপরকে ঠেলে দাঁড়াবার চেষ্টায় ব্যস্ত হন। এঁদের সকলের রচনাই আমি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করি—করে হতাশার ক্লান্তিতে বিমর্ষ হই। কারণ তাঁরা যা বলতে চাইছেন এবং মুদ্রিত অক্ষরে যা পরিবেশিত হচ্ছে তার মধ্যে কোন সেতুবন্ধন

হচ্ছে না। বেশ বুঝতে পারি তাঁরা কিছু একটা বলতে চাইছেন—কেউ বা রূপকের মাধ্যমে, কেউ ইঙ্গিতে, কেউ টুকরো টুকরো সংলাপে, কেউ ছন্দে, কেউ বিদেশী কাব্যের গন্ধে—কিন্তু কেউ স্বচ্ছন্দে নয়; যে সংহতিবোধ অনুভূতির প্রতিমা নির্মাণে স্বচ্ছল শৈল্পিক বিকাশকে সুষ্ঠু পথে নিয়ে যায় মূলত তারই অভাব প্রকটভাবে প্রকাশিত হয় মুদ্রিত প্রাণহীন বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়ার কঙ্কালসার শব্দের মিছিলে। লেখা ছাপানোর জন্য কবিযশঃপ্রার্থীদের মুক্তকচ্ছ হয়ে ছোটাছুটি দেখে ভাবি যে এই প্রাণান্ত প্রয়াসের অযুতাংশও যদি কাব্য-সৃষ্টি-প্রযাসে ব্যয়িত হতো তা হলে জীবনানন্দ-সুভাষ পরবর্তী বাংলা কাব্য-জগতে এত দিনে কিছু না কিছু সারবস্তু সঞ্চিত হতো। কবিরা বর্তমানে একে অপরের হাতে রক্ষাকবচ বেঁধে দেবার মানসে টাটকা ও গরম কবিতাগুলির উল্লেখ করে সত্যিই যে একটা মহাকাণ্ড চলছে আধুনিক কাব্যের জগতে, এটা বোঝাবার জন্য ব্রতী হচ্ছেন। বর্তমানে 'কবিতা পরিচয়' নামধেয় কবিতা-পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ দাশের কবিতার আলোচনার পাশে সদ্য আগত কবিতা-লিখিয়েদের রচনাগুলির উপর ব্যাখ্যার আলোক ফেলে অতি আধুনিক কবিতাগুলিকে একটা মর্যাদা দেবার চেষ্টা চলছে। আবার অন্যত্র 'কবি ও কবিতা' নামক পত্রিকায় কালিদাস-কুমুদ মল্লিক-বনফুল থেকে সর্বকনিষ্ঠ কবির কবিতা পরিবেশন করে বাংলা-কবিতার ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরবার চেষ্টা চলছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টাগুলিকে একত্রিত করলে মোটামুটি ভাবা যায় যে বাংলা দেশে কবিরা এখন বিভিন্ন আশ্রয় অবলম্বন করে জনসাধারণের সামনে নিজেদের অস্তিত্বকে তুলে ধরবার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন। এই দিক থেকে এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। কিন্তু প্রচেষ্টাটি শুধু এর মধ্যে সীমায়িত থাকলে চলবে না।

কাব্যনির্মাণ কালে বোধ ও যুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাব্য-

বস্তুর উপাদানকে প্রসারিত করতে হবে। নতুন কাব্যরীতি আবিষ্কার করতে গিয়ে পাঠক-সম্প্রদায়কে একেবারে নির্মূল করা উচিত হবে না। কারণ আজকে যাঁরা যে ভাবেই হোক পাদ-প্রদীপের আলোয় রাজা-উজীর সেজে চলাফেরা করছেন এবং নেপথ্যে যাঁদের নামের ঢাক-ঢোল বাজছে, তাঁদেরকে একদিন মঞ্চ খালি করে নেমে আসতে হবে পাঠকদের সামনে। সেদিন কোন দল থাকবে না, থাকবে না কোন করতাল, করতালির আয়োজন—নিজস্ব পরিচয়ের একক উপস্থিতিই তখন তাঁর পরিচিত প্রতিষ্ঠাকে ধরে রাখবে। তাই কবি সুনীল সরকার বলেন—'কবির ব্যক্তিগত সাফল্য নির্ভর করছে তিনি আধুনিক যুগের অভিজ্ঞতা-প্রসারকে কতটা ধারণ করতে পেরেছেন এবং তাঁর বক্তব্যকে কি পরিমাণে আধুনিক মনের পক্ষে গ্রহণীয় কাব্যরসাস্বাদে উত্তীর্ণ করে দিতে পেরেছেন তার উপর।' এবং একাজ খুব একটা সহজ-সাধ্য নয়। এর জন্য প্রতি কবির দস্তুরমতো প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। আধুনিক কবিতা-লিখিয়েদের সবচেয়ে যে বস্তুটি আমাকে পীড়িত করে, তা হচ্ছে নাম ছাপানোর প্রতি তাঁদের অকবিজনোচিত কাঙালপনা। সম্মান ভিক্ষালব্ধ বস্তু নয়, সাধনালব্ধ অর্জিত সামগ্রী। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পয়সা ফেলে কবিতার কাগজ বের করতে গেলে প্রেসের নিরীহ কমপোজিটররা হুকুম প্রতিপালন করে যাবে সত্য, কিন্তু মুদ্রিত শব্দগুলি কিছুতেই কবিতা হয়ে উঠবে না। সংযমহীন বাগাড়ম্বর, অর্থহীন প্রলাপোক্তিগুলিকে সম্বল করে যদি বা সাময়িক একটা স্বীকৃতি পাওয়া যায়—সেই স্বীকৃতি কিন্তু সম্মান-ভিক্ষুকদের জীর্ণ থলি ভেদ করে ক্রমাগত পড়ে যেতেই থাকবে, সঞ্চিত হবে না কিছুই। বিড়ম্বিত, উদ্‌ভ্রান্ত কবিযশঃপ্রার্থীগণের ভাগ্যে আক্ষেপ, হতাশা ও অপব্যয়ের গ্লানিই জুটবে। প্রসঙ্গত মনে পড়িয়ে দেওয়া ভাল যে কবি নয়—কবিতার চরণই পাঠকের মনের কষ্টিপাথরে অম্লান দ্যুতিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকে। আদিকবি বাল্মীকিকে মহাকাল ঠ্যাঙাড়ে এবং

কালিদাসকে মূর্খ জরদ্গব করে ছেড়েছে, কিন্তু যেখানে সে ব্যর্থ হয়েছে সেটা হচ্ছে তাঁদের কাব্যান্তর্ভুক্ত চিরকালীন সৃষ্টির স্বাক্ষরবাহী কবিতার রসমাধুর্য—যা আপনাআপনি রসজ্ঞ লোকের গলায় ফেনিয়ে ওঠে বিভিন্ন অনুভূতির সহচর হয়ে। নামের পরিচয়ে, গোষ্ঠীর পরিচয়ে, কাব্য-আন্দোলনের পুরোহিতের পরিচয়ে যিনি পরিচিত তিনি ক্রমশ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান, আর বিপুল বেগে উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠে পাঠকের হৃদয়াকাশকে অফুরন্ত রঙের মহিমায় উদ্ভাসিত করে তোলে মহত্তোমহীয়ান হিরণ্য-গর্ভ আদিত্য-দেবের মতো সেইসব কবিদের সৃষ্ট মহাকালজয়ী বাগীশ্বরী দ্যোতনার বাক্‌প্রতিমাগুলি—ব্যঞ্জনায় যা মনোহর, গ্রন্থনায় যা অভিরাম, বিকাশে যা শতদলের উন্মোচনের ন্যায় অপরূপ।

'কবিতা মন থেকেই লেখা হয় বটে, কিন্তু তা স্বয়ম্ভু নয়। কবিতা আসলে, 'কমিউনিকেশন'। তাই কবিতার ভেতরে যদি এমন কিছুই না থাকে যাতে পাঠকগণ তাঁদের সামাজিক এবং আত্মিক অস্তিত্বের প্রতিফলন খুঁজে না পান, যদি তাঁদের আশা হতাশা এবং সংঘর্ষ জয়-পরাজয় সংগ্রামের কোনো গভীরতর ব্যঞ্জনা ফুটে না ওঠে তাঁদের পঠিত কবিতায়, তবে সে কবিতা যতো পদলালিত্য এবং মনোরম বাক্‌চাতুরীতেই সিদ্ধ হোক, তা দু'দণ্ডের অবকাশরঞ্জনেই হারিয়ে যাবে। কখনোই পাঠকের অন্তঃকরণের মধ্যে নবজন্ম লাভ করবে না। সেই কারণে বৃহত্তর সামাজিক পটভূমি ও দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন হওয়া দেখা যায় ভালো কবির সহজাত ধর্ম। আর তাই সামাজিক দায়িত্বহীন কবিতা গভীরতর শিল্পে আবেদনের দিক দিয়েই হয়ে ওঠে নিঃসার ও তুচ্ছ।'

১৩৭৪র চতুর্থ সংকলন 'সীমান্ত' পত্রিকায় কবি মণীন্দ্র রায়ের 'বাংলা কবিতা ও ষাটের কবি' শীর্ষক কবিতা-বিষয়ক ভাবনায় যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। অগ্রজ কবিদের

চিন্তাভাবনাকে, তাঁদের কাব্যগুলিকে তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দেওয়ার যে চিৎকৃত উল্লাস অধুনা পরিলক্ষিত হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে অস্বাস্থ্যকর। হাংরি-জেনারেশনের, কবিদের বিটলেপনা, অনেক লাফালাফিই তো দেখলাম। অবশেষে এও দেখছি যে একটু ঘুরপাক খেয়ে অবশেষে. লিরিক কবিতার কাঠামোতেই কবিতা লিখে খুন হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। চটকদার উৎকট প্রয়াস কিছুদিনের সঙ্গী হয় মাত্র। সৃষ্টশীল অনুশীলনের ক্ষেত্রে কিন্তু দেশকালগত ধারাবাহিকতাকে এড়িয়ে নতুন কিছু করার উপায় থাকে না। বিদেশের কাব্যচর্চাকে সামনে রেখে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা চলে কবিতার মেজাজে, আঙ্গিকে, বক্তব্যে কিন্তু যে ভাষায় রচিত হলো, সে ভাষায় কবিতাপাঠকদের সঙ্গে যদি তার যথাযোগ্য সংযোজন স্থাপিত না হয় তা হলে পাঠকদের পক্ষ থেকে নিস্পৃহ ভাব দেখাবার আগেই কবি স্বয়ং নিস্তেজ হয়ে পড়ে পাঠকদের দরবারে ঘরের ছেলে হয়ে ঘরে ফেরেন। অধুনালুপ্ত বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ক কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। 'বর্তমানে কবিযশঃপ্রার্থী তরুণদের অনেকের মধ্যেই সম্ভাবনা আছে, তবুও সিদ্ধির ক্ষেত্রে বেশির ভাগই তাঁরা খণ্ডিত। আত্মপ্রকাশের তাড়নায় কিংবা খ্যাতির বিড়ম্বিত বাসনায় অনেকেই স্ব-স্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনরূপ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন বোধ করেন না। যে নিয়ম, নিষ্ঠা এবং ধৈর্যশীল সংযম থাকলে স্রষ্টা তার সৃষ্টির স্বল্পতার মধ্যেও অর্থময় হয়ে ওঠেন তা অনেকেরই নেই। যে সাহিত্য 'বনলতা সেন,' 'সংবর্ত্ত' বা 'পালাবদলের' মতো কাব্যগ্রন্থে ভাস্বর, সেখানে এ ধরণের ক্রমিক অবনতি দেখে নৈরাশ্য এড়ানো যায় না। কবিতা লেখা শিক্ষার প্রয়োজন তাই স্বীকার না করে উপায় নেই।' প্রায় এক যুগ আগের এ বক্তব্য থেকে এখনো কবিরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। এবং এখনও এমন কোন কারণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না যাতে করে কোন সুস্থ নিরপেক্ষ পাঠক

তাঁর ধারণা পাল্‌টাতে পারেন যে ক্রমিক অবনতি থেকে কবিতা বিন্দু-মাত্র উর্ধ্বমুখী হয়েছে। বরং বলা যায় আধুনিক কবিতার ক্রমিক অবনতি এখন এমনতর পর্যায়ে এসেছে যে সাধারণ পাঠককুল অধুনা প্রকাশিত কবিতা-পত্রিকাগুলিতে কবিদের পরস্পর আক্ষেপ-বিক্ষোভ-উল্লাস-আক্রমণ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ পোষণ করছেন না ঐ সমস্ত বস্তুসম্ভার যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁরাই পড়েন কিংবা বলা যায় যাঁরা পড়েন তাঁরাই লেখেন। এ নিয়ে পাঠক-দের কোন মাথাব্যথা নেই। এই দীনতার হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পন্থা কবিতা-সম্পর্কিত সম্যক আলোচনার সূত্রপাত করা। 'neither to bury Caesar nor to praise him' রীতির সমা-লোচনার অন্তঃসারশূন্য রূপটি অত্যন্ত প্রকট ভাবে অধুনা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। সৎ সমালোচনার একান্ত অভাবই বর্তমান কবিতার নিম্নগতির একমাত্র কারণ, যার ফলে অনেক বেনোজল ঢুকে পড়ছে। এবং এই বেনোজলের প্লাবনে এখন বিশিষ্ট কবিদের স্বকীয়তা চেনা দুষ্কর। বাংলা কবিতার যে ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা তার যাবতীয় বেগবতী সত্তা নিয়ে বয়ে চলেছিল সেই ধারার এমনতর বিনষ্টি অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। অগ্রজ প্রতিষ্ঠিত কবিরা জন-প্রিয়তা হারাবার সকল ঝুঁকি নিয়ে যদি না শল্যবিদের নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে সমালোচনের দায়িত্ব নেন, তা হলে সংখ্যাগত দিক থেকে কবি ও কবিতার উন্নতি হবে ঠিক কিন্তু গুণগত মান চরম ভাবে ব্যাহত হবে—এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে প্রাথমিক পর্বে কোন কবি যখন তাঁর কাব্যবস্তু নিয়ে হাজির হন তাতে যথেষ্ট পরিমাণ মনন, চিন্তা সচেতনতা ও বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু দেখা যায় সেই কবি যখন ধীরে ধীরে পত্র-পত্রিকার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন তখন তিনি ক্রমশই তাঁর অমনোযোগী সত্তাকে পরম আগ্রহে তুলে ধরেন। এত বেশী তাঁকে

কবিতা লিখতে হয় যে তখন তাঁর নিষ্ঠা শিকেয় তোলা থাকে। কাজেই 'কোয়ালিটি ও কণ্ট্রোল' সূত্র প্রয়োগ না করলে আধুনিক কবিতা-লিখিয়েদের বৈশিষ্ট্য অর্জন অসম্ভব। পত্রিকার তাগিদে ও চাহিদার হাতে হাত রাখতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও অনেক বাজে কবিতা লিখতে হয়েছে। অন্য কবিদের কথা না হয় বাদ দিলাম।

এমন একটা সময় ছিল যখন কবিতা লিখে প্রকাশ করা খুব সহজ-সাধ্য ছিল না। অপেক্ষা করতে হতো সম্পাদকের মনোনয়নের উপর, প্রতীক্ষা করতে হতো স্থান পাবার জন্যে, তবে এখন কবিতার কাগজ অনেক। শহর-মফঃস্বল-গ্রাম এমন কি বাংলাদেশের বাইরে থেকেও প্রকাশিত বাংলা কাগজে কবিতা ছাপবার স্থানের অভাব হয় না। দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, পাক্ষিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, বার্ষিকীতে কবিতা প্রকাশের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত। সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা থাকলেও সম্পাদনার ঝুঁকি কেউ নিতে চান না—তা সে সময়াভাবেই হোক অথবা অপ্রিয় কাজের জন্যেই হোক। ফলে তরুণতর কবিরা সহজেই প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের বিতরণ করছেন। এবং অত্যন্ত স্বল্প মেধা নিয়ে, সীমিত বক্তব্য নিয়ে, ছন্দ সম্বন্ধে প্রচণ্ড অজ্ঞতা নিয়ে প্রাণপাত করছেন কবিতা সৃজনের ক্ষেত্রে। 'ব্যস্ত রয়েছেন কবিতার প্রকার নিয়ে নয় তার প্রচার নিয়ে, পরিমাণ নিয়ে। তাই অনেক লেখাই পাণ্ডুর হয়েছে বর্ণের অভাবে, তরল হয়েছে পদার্থের অপ্রাচুর্যে' (রাজলক্ষ্মী দেবী)। যে মিলিত প্রয়াসের আন্তরিক উদ্বেলতায় বাংলা-কবিতা মুক্তি পেতে চাইছে নতুন দিগন্তে, তার মধ্যে রণ-পায়ের উপর চড়ে কেউ কেউ নিজের অস্তিত্বকে সঙের মতো তুলে ধরতে চাইছেন। কিন্তু এখনও তুলে ধরার সময় আসেনি। কবিতার ভাঁড়ারে কিছু জমা পড়লে সময় নিজেই তার অপেক্ষমান করতল প্রসারিত করবে সাগ্রহে বুকে তুলে নেবার জন্যে।

প্রতিবেশিনীর কাছে

যে কোন আঙ্গিকেই হোক, বা বিষয়বস্তু নিয়েই হোক কবিতা রচনা করা আপাতদৃষ্টিতে যতটা সস্তা করে তোলা হয়েছে প্রকৃত অর্থে কিন্তু তা নয়·বরং তার বিপরীত। আমার তো এক এক সময় মনে হয় বিয়ের পদ্য রচনা করার চেয়েও আধুনিক কবিতা-লিখিয়েরা কবিতা রচনা-কার্যটিকে সহজসাধ্য করে তুলেছেন। কারণ বিয়ের পদ্য রচনা করতে গেলে খানিকটা ছন্দ মেনে লিখতে হয়, নব দম্পতির সুখশান্তির জন্য বিধাতার কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাতে হয়, কোন নিকট আত্মীয় মারা গেলে তাঁর কথা স্মরণ করে বিলাপ করতে হয় এবং তিনি যদি বিবাহবাসরে উপস্থিত থাকতেন তা হলে আনন্দের অবধি থাকতো না—এ রকম একটি মনোভাবও ব্যক্ত করতে হয়। অর্থাৎ রচনাকার্যটির জন্য অখণ্ড মনোযোগের প্রয়োজন থাকে তবে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করে। আধুনিক কবিতার দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে কোন নিয়মনিষ্ঠার বালাই নেই। আলোচনার সূত্রপাত হলে থিয়োরীর ভূত এসে ঘাড় মটকাতে আরম্ভ করবে। এলিয়ট-র‍্যাঁবো রিলকে থেকে আরম্ভ করে বদ্‌লেয়র, মায়াকভস্কি, ইয়েভ্‌তুশেঙ্কো কণ্ঠস্বরকে অধিকার করবে। স্বচ্ছ ভাবনার বিন্দুমাত্র অবসর থাকবে না। কারণ বাংলা কাব্য তো এখন আর সঙ্কীর্ণ খাত অবলম্বন করে বয়ে চলছে না। সে এখন পৃথিবীর কাব্যস্রোতের মিলিত মোহনায় মুক্তির ভৈরব উল্লাসে প্রত্যহ স্নান করে। অস্বীকার করি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে আসে যে বিস্তৃত সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে নতুন কিছু বলা, নতুন করে বলার অধিকার অর্জন করার জন্যে যে সাধনা, সে সাধনা কোথায়? স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের যুগ ফুরিয়ে গেলেও এখনও শত শত 'আধুনিক গোবিন্দদাস' শব্দ সাজাবার নৈপুণ্য লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত।

প্রসঙ্গত অগ্রজ কবিদের কথাও সামান্য ভেবে দেখা যাক: আধুনিক কবিতাচর্চার সঙ্গে তাঁরা কীভাবে জড়িত রয়েছেন। অগ্রজ কবিদের

প্রতিবেশিনীর কাছে

অনেকেই আজ লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। একদিন তাঁরা বাংলা কবিতার বিকাশসাধনে অনেক মনে রাখার মতো কবিতা লিখেছেন। এখনো অশোক বিজয় রাহা, সুনীল সরকার, দিনেশ দাশ; নরেশ গুহ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, অরুণ মিত্র মণীশ ঘটক, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, বিমল চন্দ্র ঘোষ, বিশ্ব বন্দোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রভৃতি কবিদের স্মরণীয় পংক্তি অকারণে গলায় ফেনিয়ে উঠে। এঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে কদাচিৎ কেউ কেউ লেখেন বটে তবে পুর্বের সে তাপ এখন অনেক স্তিমিত। লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবু যেন জানতে মন যায় কেন তাঁরা আর লেখেন না—কোন অভিমানে অথবা বেদনায় কিংবা অনীহায়, নাকি কবিতার আসরে [illegible] বাজীমাৎ করবার লালসা প্রত্যক্ষ করে। কে জানে। তবে বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়া সৎ কবিগোষ্ঠী যখন দল বেঁধে কবিতা লেখা ছেড়ে দেন তখন দুঃখ হয় বৈকি। অন্যদিকে যাঁরা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এখনো তরুণের উদ্যম নিয়ে প্রায় সকল কাগজেই লেখা বিতরণ করে চলেছেন তাঁদের রচনাগুলি পাঠ করলে দেখা যায়, স্ব-স্ব পরিধিতে তাঁরা কোন উল্লেখযোগ্য প্রসার নিয়ে আসতে পারছেন না। বরং ষষ্ঠ দশকের প্রবেশপথে তাঁদের যে গৌরবময় অস্তিত্ব ছিল সেখানেই পুর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে। আশা করা তো অসঙ্গত নয় যে অভিজ্ঞতা-অনুশীলনের মিলিত দাক্ষিণ্যে অর্জিত দার্শনিকতায় তাঁরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন। নবাগতদের আসরে অগ্রজ কবিদের উপস্থিতি তাঁদের মেধাবী হৃদয়ের সজীবতাকে প্রকাশ করে সত্য কিন্তু তাঁরা যখন দায়সারা অগভীর উপলব্ধি-সঞ্জাত রচনা পরিবেশন করেন তখন সেখানেও পরম হতাশার কারণ থেকে যায়। যাঁরা কাব্যের আসর থেকে চলে গেলেন তাঁদের জন্য যেমন আক্ষেপ হয়, তেমনি যাঁরা রয়ে গেছেন তাঁরা নিজস্ব কৌলীন্য বজায় রেখে চর্চা করবেন এ রকম একটা আশা সৎ কবিতা-পাঠক অবশ্যই করেন। কবিকে

প্রতিবেশিনীর কাছে

উদ্দেশ্য করে লেখা পুশকিনের কবিতাটি উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কবিকে

লোকের ভালবাসায় তুমি কান দিও না কবি
হাতের তালি খানিক পরে সব মিলিয়ে যাবে
মূর্খজনের বিজ্ঞ বিচার এবং অসংখ্যের
প্রাণহীন সেই হাস্যরোল শুনবে অবশেষে।

রাজন তুমি, দৃপ্ত দাঁড়াও অকম্প্র গম্ভীর
সম্রাটেরা বাঁচেন তাঁদের একক গৌরবে
মুক্ত-আত্মা ডাকে তোমায়, পেরিয়ে চল তুমি
স্বপ্ন-কোরক ফুটে উঠুক নিটোল পূর্ণতায়।

দাম চেয়োনা কাজের তা সে যতই জয়ী হও
প্রশংসা তো অন্তর্লীন : তুমিই দণ্ডদাতা
সবার চেয়ে বিচার তোমার অমোঘ তীক্ষ্ণতম
তৃপ্ত তুমি ? পশুর পাল করুক না গর্জন ;

যজ্ঞাগ্নির নৃত্যপরা সুবাস-বেদীমূলে
ছড়িয়ে দিক নিষ্ঠীবন যতটা পারে লোকে।

[লেখক কর্তৃক অনূদিত]

নতুন গল্পরীতি

নতুন গল্পরীতি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে হলে এগিয়ে যেতে হবে পূর্ববর্তী দশকের শেষের দিকে। সেই সময় থেকে বস্তুত-পক্ষে এক বিশেষ রীতির অনুশীলন সুস্পষ্টভাবে দানা বেঁধে উঠছে। সে রীতির পরিণতি কি? আসলে সেই রীতিটি গ্রহণযোগ্য কি না—এ কথা ভেবে দেখবার সময় হয়ত এখনও আসেনি। তবু আলোচনা করতে দোষ দেখি না। রীতিটির নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত—'Stream of consciousness' অর্থাৎ বাংলা তর্জমায় 'চৈতন্য-প্রবাহ'। এই চৈতন্য-প্রবাহে ভর করে এক বিচিত্র স্বাদের গল্প-ধারা নেমে আসছে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা রস সাহিত্যের অঙ্গনে। এর অন্তঃসারশূন্যতার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে কিংবা বলা যায় অসহায়তায় হতবাক হয়ে যাচ্ছেন সাধারণ পাঠকবৃন্দ। অথচ একে সম্পূর্ণ নাকচ করতেও অনিচ্ছুক। 'সাধারণ পাঠকবৃন্দ' কথাটিকে আরও একটু পরিষ্কার করা উচিত। তাঁদেরকেই ঐ শব্দের গণ্ডীতে আনতে চাই যাঁরা বই পেলে সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। হৃদয়-সংবেদ্য উল্লেখযোগ্য বাক্যের সন্ধান পেলে কালি বা পেন্সিলের দাগ দিয়ে জায়গাটি চিহ্নিত করেন, কোন পাপবোধই তাঁদেরকে বিক্ষত করে না যে এতে বইটি তার নিজস্ব শ্রী হারাচ্ছে। বইটি নিজের না হয়ে যদি অপরের হয় তাহলে এবম্বিধ কার্যকে পবিত্র কর্তব্য ভাবেন। এমন যে পাঠক, যাঁরা মোটামুটি দেশের ঐতিহ্যশীল প্রচলিত রস-সাহিত্যের ধারাটির সঙ্গে পরিচিত, তাঁদেরকেই ঐ নামে চিহ্নিত করছি। 'সাধারণ পাঠক', অর্থে জনসাধারণ নিশ্চিত নয়। এঁদের অনেকই ঐ 'চৈতন্য-প্রবাহ' নামক রীতিতে গঠিত গল্পধারাকে সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করতে দিতে যথেষ্ট কুণ্ঠিত। তাঁদের মতে ঐ 'না বলা বাণীর ঘন

যামিনীর মাঝে তোমার ভাবনা তারার মত রাজে' ধরণের গল্পকে মেনে নিতে হলে নিজেদেরকে হয় 'পরমেশ্বর' নতুবা 'পরম গাড়ল' ভাবতে হয়।

প্রতিটি নতুনের ক্ষেত্রে যেমন একদল উগ্র আগ্রহী সমর্থক থাকেন, আবার অন্যদিকে ক্রুদ্ধদলও অপেক্ষা করেন আক্রমণের খড়্গ শানিয়ে, 'নতুন রীতির' গল্পের ভাগ্যেও সেই একই অবস্থা ঘটেছে। এই রীতির গল্প এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। কোন সুষম আকৃতি-প্রকৃতির বাঁধনে ধরা পড়েনি একথা বলাই বাহুল্য। তবু আগ্রহী গল্প পাঠক পাঠিকার চোখে নিশ্চয়ই কিছু সৎ লেখকের উৎকৃষ্ট রচনা এরই মধ্যে ধরা পড়বার চেষ্টা করছে। এটা আশার কথা। যাঁরা বুঝে না বুঝে, যেহেতু নতুন সেজন্য প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁদের মতটি শুনলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সদ্যোজাত এই রীতিটির পূর্বে যে সমস্ত গল্প গঠিত হয়েছে সেগুলি নিছকই গল্প—নির্বোধ লেখকের দ্বারা নির্বোধতম পাঠকদের জন্যে রচিত। পঞ্চতন্ত্র, বাইবেল- এর গল্প থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ মঁপাসা সকলই ক্লান্তিকর।

গাম্ভীর্যপূর্ণ, টেবিল-আলোড়িত এই যুক্তির বালখিল্যতা সত্যিই হাস্যাস্পদ। নতুন রীতির প্রকৃষ্ট গ্রহণক্ষীমতা নিশ্চয়ই ঐ 'অপূর্ব' যুক্তিতে প্রাপ্য সম্মান পায়না।

গদ্যকবিতা ও কবিতার মধ্যে যেমন একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে আমার মনে হয় 'ঐতিহ্যশীল' ও 'নতুনরীতির' গল্পের মধ্যেও সেইরূপ একটি পার্থক্য বর্তমান। বাংলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার অনুপ্রবেশ যেমন সহজভাবে হয়নি—অনেক ঝড়-জল সহ্য করে, পরে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে, নতুন রীতির গল্পকেও সেইরকম ভাবে তার আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে কুশলী লেখকদের পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে। গদ্যকবিতার হাত ধরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাকে

আসরে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। 'নতুন রীতি গল্পের' দুর্ভাগ্য তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও তেমন কোন শক্তিমান গল্পকার এখনও পর্যন্ত বর্তমান লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হননি যিনি এই মহৎ দায়িত্ব উদ্‌যাপনে বিশেষ সুপটু। কিন্তু তাই বলে যে সাহিত্যের সাগর সঙ্গমে অন্য একটি নতুন ধারা এসে মিলবার চেষ্টা করছে তাকে দণ্ডাঘাত করে, ধমক দিয়ে উৎসে ফিরে যেতে বলা হবে এটাই বা কেমন কথা।

Stream of consciousness বা নতুন রীতির গল্প ক্বচিৎ কখনো একটি বা দুটি ভালো হবে সেই আশায় না থেকে ঐতিহ্যশীল অর্থাৎ বাঁধানো রাজপথে অগ্রসর হওয়া শতগুণে শ্রেয়—এই যদি মনোভাব হয় তবে তাকে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা চলে নতুন রীতিই হোক পুরোনো রীতিই হোক, কোনকালে যা নতুন প্রচলিত হয় সেটা প্রশংসা পায়? এই দশকের বিচার তাই এই দশকে হয় না। এর জন্য প্রতীক্ষার প্রয়োজন আছে। প্রতীক্ষার অপেক্ষায় না থেকে তাকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা যদি সত্যিই করতে হয় তাহলে সক্রিয় সাধনাই একমাত্র ভরসা হতে পারে। বিপুলা পৃথিবী ও মহাকালের হাতে বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে আসুন আমরা এই রীতিকে অভিনন্দিত করি। পরিণতি কি হবে সে কথা পরে বিচার্য, নব জাতকের আবির্ভাব মুহূর্তে শুভ শঙ্খনাদের প্রয়োজন আছে। এই অভিনন্দন করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, যা কিছু নতুন রীতিতে পরিবেশন করা হবে তাকেই আমরা গোগ্রাসে গিলে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলব। সাহিত্যের রসপানে কাঙাল হতে পারি তবে তা যদি 'কাঙালী ভোজন' এই অর্থের যথার্থ নামাবলী জড়িয়ে আসে তাকে নিশ্চয় মেনে নেব না। নিতে পারি না।

যখনই কোন নতুন প্লাবন আসে, তখনই তা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আবেগে সব কিছুকে ভাসিয়ে দিতে চায়। অমন যে বিষ্ণুপদ-বিগলিত

গঙ্গার পুণ্য বারিধারা সেও জহ্নুমুনির আশ্রম ভাসিয়ে দিয়েছিল। তিনিও অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। পরে অপরূপ বিচক্ষণতায় জানু বিদীর্ণ করে মুক্তি দেন। সমালোচকরা নিশ্চয়ই নতুন ধারাকে বাজিয়ে নেবেন, তবে একেবারে যদি বরখাস্ত করেন তাহলে আর যাই হোক বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া হবে না।

Stream of consciousness বা 'চৈতন্য-প্রবাহ' কথাটি নিয়ে কিছু ভাবা দরকার। 'চৈতন্য-প্রবাহ' নতুন আমদানী করা শব্দ। ব্যাপারটি কি ? না শিল্পী বা সাহিত্যিকের মনে যে জাগ্রত চৈতন্য তা লিখিত বস্তুতে ছড়িয়ে পড়বে, লেখকের মননজাত সুখ, দুঃখ, বিষাদ, বেদনার সম অংশীদার হবে পাঠকবৃন্দ, এই হচ্ছে মোদ্দা কথা তবে আমার ধারণা, চৈতন্য-প্রবাহ মূলক গল্পে একমাত্র বিষাদটিই যথোচিতভাবে ছড়িয়ে দিতে পারা যায় কারণ চিন্তাশীল মন আনন্দের সঞ্চয় অপেক্ষা বিষন্ন-বোধের দীর্ঘস্থায়ী স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। কিন্তু এ সকল কথার উর্ধ্বে যে ধারণাটি আলোচিত হতে চলেছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য, 'চৈতন্য-প্রবাহে'র ফলশ্রুতি কি যে কোন মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে বিজড়িত নয়। মহৎ সাহিত্যের সংজ্ঞাই তো এই যে রচিত সামগ্রী পাঠকের অন্তর ভেদ করে সুখ-দুঃখ-বেদনার উৎসমুখ খুলে দেবে। অনুভবের ধারাস্নানে হৃদয় সঞ্জীবিত হবে। হৃদয়গত চৈতন্যে প্লাবিত না হলে কে কবে মহৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন ? কাহিনীর অন্তরালে ঐ চৈতন্যই তো প্রবাহিত হয়। শুধু মাত্র জলধারার বর্তমানতা অপেক্ষা গিরিগাত্র অবলম্বনকারী শব্দিত ফেনময় পতনশীল বেগময়তা কি কম আকর্ষণীয়! দিগন্তবিস্তারী প্লাবিত জলের অথৈ রূপ যেমন নগন্য নয় তেমনি নগন্য নয় ক্ষীণ তাপসী অপর্ণা তুল্য ঝর্ণার অস্তিত্ব। যতই না কেন নয়নাভিরাম হোক, পট-পরিবর্তনের জন্য দুটি রূপেরই প্রয়োজন আছে।

আলোচিত রীতির প্রবর্তনা শুধু মাত্র বাংলা ভাষাজ্ঞানী

পাঠকমহলে সম্পূর্ণ নতুন মনে হতে পারে কিন্তু তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে সেটা সত্যি নয়। জর্জ এলিয়ট, এমিলি ব্রন্টি, ফ্রান্জ কফ্‌কা ও হেনরী জেমস-এর লেখার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলা সাহিত্যের প্রসবাগারে আবির্ভূত হবার বহু আগে ঐ রীতি য়ুরোপে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। আমার মনে হয় কফ্‌কা'র 'দি মেটামরফসিস্' গল্পটি বাংলাদেশের নবীন সাহিত্য যশঃপ্রার্থী কর্মীবৃন্দের কাছে প্রভূত প্রেরণা যোগাচ্ছে, যেমন কিছুকাল আগে একদল যুবকের বদ্‌লেয়র ও র‍্যাঁবোর কবিতা পরম অভিজ্ঞান ছিল। অথচ এই ভুবনবিদিত নতুন চেতনার অগ্রদূত আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশের প্রথিতযশা কবির হাতে যখন একের পর এক তাঁর কবিতা অবলম্বনে রচিত অনুবাদ কর্ম প্রকাশিত হলো তখন বিস্ময়াবিষ্ট কবিযশঃপ্রার্থী নবীনেরা নিজেদের চেতনাকে বদ্‌লেয়রী ঢঙে কাব্য রচনায় সবিশেষ ব্যস্ত রেখে নতুন কাব্য চেতনার ঢক্কানিনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত করতে চাইলেন। বিচক্ষণ ও ধৈর্যশীল পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন সেই ঢাকের বাদ্যি থেমে গেছে কারণ পুরোনো চামড়ায় কাঠি পড়তে না পড়তেই ফেটে চৌচির—ভেতরের অন্তঃসারশূন্যতা বিদ্রূপের অন্ধকার নিয়ে পরিব্যাপ্ত। নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার, আর আবিষ্কার না করে আহরণ করে নতুনত্বের নামে চালানো দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। বর্তমান কালের পাঠকরা অনেক উন্নত। পঠন-পাঠনে লেখকদেরকে কোন কোন স্থলে ছাড়িয়ে যান বললে অত্যুক্তি করা হয় না। তফাৎ এই, লেখকদের মতো তাঁরা লিখতে পারেন না। নচেৎ কোথা থেকে কি আহরিত হচ্ছে এ খবর অনেকেই রাখেন। কাজেই দলবদ্ধ চীৎকারে ত্রিভুবন কাঁপালেও এবং 'ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোর্তিময়' বলে নিজেদেরকে নতুন ধারার প্রবর্তনকারী ভগীরথ ভাবলেও পাঠকদের করুণা প্রদর্শন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

বর্তমান দশকের সরব প্রচারের পূর্বে বাংলা সাহিত্যেও কয়েকজন সাহিত্যসাধক এই রীতি অবলম্বন করে ব্রতী হয়েছিলেন রচনা প্রয়াসে। সুখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর 'একা' 'রেখা' গল্পগুলির আঙ্গিক আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে দাঁড়াবে। শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারের, ছোট গল্পের বই না হলেও, 'একদা' উপন্যাসখানি এই রীতিতে উচ্চ-স্তরের মননশীল, জীবনবিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার বিশিষ্টতা নিয়ে স্বকীয় দীপ্তির ভাস্বরতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদিও ভার্জিনিয়া উলফ এবং তাঁর সমসাময়িক ইংরেজদের চাতুর্যে উপন্যাসখানির শরীর গঠিত।

অতএব খুব যে নতুন, একেবারে আনকোরা, ভূ-ভারতে আর কোথাও এরকমটি ছিল না একথা ভাবা এবং ভেবে উরু চাপড়ানো 'কুইকজোটিয়' উল্লাস ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বিশ্বের সুধী সমাজে পরিচিত সারভাঁতের ওই চরিত্রটির কথা চিন্তা করেও অন্ততঃ উৎসাহকে কিছুটা নিবৃত্ত করা দরকার।

নতুন রীতির তরোয়ালে কেটে কুচি কুচি করে দিচ্ছি, পুরানো যা অবশিষ্ট আছে সে সব হাঁপাচ্ছে, পর্যুদস্ত হয়ে—বলে এই যে লড়াই; কার বিরুদ্ধে? প্রতিপক্ষ 'হাওয়া' নয়তো?

নতুন গল্পরীতি আলোচনা করতে গিয়ে পুরোনো 'মুনি-মূষিক কথা' মনে পড়ছে। বিগত দিনের গল্পকারদের উপর নবীনেরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়েন আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে তখন এই গল্পটি স্বভাবতই মনে আসে।

সুপ্রাচীন ও মহান ঐতিহ্যের রসে পুষ্ট নবীন গল্পকাররা কলম ধরার আগে 'নিজেদের' মুখপত্র বের করেন, কাগজের বুকে আঁচড় কাটার আগেই গলাবাজীতে মুখর হন। একে অপরের পিঠ চুলকে দেবেন—এ রকম একটা অলিখিত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ চুক্তি নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো স্বকীয় বিবর্ণতায় ফুটে ওঠবার চেষ্টা করেন এবং ফোটবার আগেই পঞ্চভূতে মিলিয়ে যান।

এসব কোন বক্তব্যই নয়। বক্তব্য অন্যত্রে। প্রথমে ভাবতে হবে সব গল্পই কি আমরা নতুন রীতির কম্বেতে ঢেলে সাজবো ? চিরন্তন ঠিকরেটিকেও যদি ফেলে দিয়ে নতুন পদ্ধতির আশ্রয়ে সাজতে যাওয়া যায় তাহলে সাজাই হবে, উদ্দেশ্য সেস্থলে ব্যর্থ। ঢেলে সাজার প্রয়োজন আছে, তবে পরিমিতি বোধ থাকা প্রয়োজন। নতুন রীতিতে লেখা গল্পের উপর যাঁরা নজর দেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রেখেছেন যে উতরে যাওয়া কোন কোন গল্পেরক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এই রীতির প্রয়োজন ছিল, নইলে সেই মনোভাবটি প্রকাশ পেতনা। লেখার আগে সবজেক্ট অনুযায়ী রীতি গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। যেমন কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাব কখনও লিরিকে, কখনও দৃঢ় সনেটে, কখনও কাব্য-নাট্যে ধরা পড়ে, একই মাধ্যমে একই আঙ্গিকে ধরা দেয় না, সেই রকম সব গল্পের গায়ে যদি আমরা নতুন রীতির কম্বল জড়িয়ে দিই তাহলে নিশ্চয়ই ব্যর্থ অপপ্রয়াসে সেগুলি দমবন্ধ শ্বাসরোধে ছটফট করবে।

'এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।'

অথবা 'নীর বিন্দু দুর্বাদলে নিত্য কি রে ঝলমলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সৃদ্যঃপাতি ?'

অথবা 'চলতে পথে মটর শুঁটি জড়িয়ে দু'খান পা
বলছে থেমে গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা'

কবিতা গুলির সব কটিকে যদি সুধীন দত্তীয় কায়দায় সনেটে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা যায় তাহলে ঐসব কবিদের আত্মার চীৎকারে কর্ণপটহ বিদীর্ণ হবে। জীবনানন্দ দাশের অপরূপ কবিতা সমষ্টি 'রূপসী বাংলার' অন্তর্গত বিষয়গুলি এ শতাব্দীর বিস্ময় হলেও সমগ্র বইখানি কম বেশী একই আঙ্গিককে রচিত বলে বেশীক্ষণ পড়া অসম্ভব। প্রচুর ভক্তি নিয়ে বসলেও কয়েক পাতা পড়ার শেষে অপ্রতিরোধ্য বিরক্তিতে মন বিপন্ন হতে বাধ্য।

ঠিক একই কথা বলা চলে গল্পেরও আঙ্গিক নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের রাত্রি' 'পোষ্ট মাষ্টার' যদি নতুন রীতির ছাঁচে ফেলা যায় তাহলে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ডই না ঘটবে ?

তাই বলি যেখানে যে আঙ্গিক প্রয়োজন তার সুষম প্রয়োগ করাই ভালো। পুরাতন পদ্ধতিকে নস্যাৎ করে নতুনকে যদি সবক্ষেত্রে অবলম্বন ক'রি তাহলে সেও তো এক প্রকারের জীর্ণ মনের সঙ্কীর্ণতায় পর্যবসিত হবে।

এরপর কাহিনীর কথা আসে। মূলতঃ গল্পের যেটা প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ কাহিনী, সেটিকে অনুপস্থিত রেখে বিন্যাসের কুশলতায় দক্ষতা দেখালে কিছুই হবেনা। পাগলের প্রলাপোক্তি হবে। যতই 'এরেভেলেন্ট' উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে সৌষম্য আনা যাক, পাগলা গারদের আবদ্ধ রোগীর আত্মকথনকে কখনই তা ছাপিয়ে যাবে না। একথা আমি রাঁচীর মানসিক হাসপাতালে জনৈক আত্মীয়কে ভর্তি করতে যাবার সময় জেনে এসেছি। কি চমৎকার গম্ভীরভাবে জ্ঞানবানের মতো কথাই না বলছিলেন কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে জনৈক উন্মাদ। সেই সময়ে মনে হয়েছিল পাগলটির কথাগুলি টেপ করে বাজিয়ে শুনে লিখে ছাপালে 'নতুন রীতির' গল্পের জগতে একটা বৈপ্লবিক আলোড়ন তুলত।

আর একটি বিষয়ের অবতারণা করে বক্তব্য শেষ করি। বক্তব্যটি হচ্ছে অনেকে মনে করেন গল্প ও কবিতার যে দুটি স্বতন্ত্র খাত রয়েছে তার মাঝে খাল কেটে দেওয়া দরকার। গল্প ও কবিতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজন নেই। বরং অঙ্গাঙ্গী সংমিশ্রণ ঘটলে একটি নতুন সামর্থ আসবে। কোনো রচনাকেই জল-নিরোধক প্রকোষ্ঠে বন্দী রাখা উচিত নয়—এটা ঠিক। কিন্তু কি লিখতে যাচ্ছি এটি ভুলে গেলেও চলবে না। গল্প লিখতে গেলে সর্বোপরি সেটা গল্প হবে এবং কাব্য-কবিতা রচনা করতে গেলে মোটামুটি কাব্যময়তার দিকে পাল্লা ঝুঁকবে একথা

অস্বীকার করার প্রয়োজন দেখিনা। নতুন খাল কাটার কথা মেনে নিয়েও বলতে হয়, খাল কাটা ভাল ; তবে লক্ষ্য রাখতে হবে নতুন-কাটা খাল পথে যেন কুমীর না আসে। নতুন কিছু করার সময় এক প্রকার উন্মাদনা আসে, তাকে বড়োই রমণীয় ও প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়, মনে হয় এতদিন এই বস্তুটি ছাড়া চলছিল কি করে? এমনতর শত সহস্র জিজ্ঞাসায় আলোড়িত হৃদয় সহসা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই সময় কিন্তু গভীর সংযম ও তন্নিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, নইলে ভাবোন্মাদনার কুমীরের পেটে সকল উদ্যম চলে যাবে। গল্পও হবে না, কবিতাও হবে না।

অঙ্গ প্রসাধন বড় কথা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে কার অঙ্গ প্রসাধন করতে যাচ্ছি সেটি যেন মনে থাকে। নইলে হাতীর গলায় বকলেস ও কুকুরের গলায় ঘণ্টা বাঁধা হবে। ক্ষমতা যাঁর আছে তাঁর কাছে কোন রীতি সেটি বিচার্য নয়, কতটা অমৃতমণ্ডিত হল সেটাই বড় কথা।

স্মৃতিতীর্থ ঃ চিল্কা

নির্জন সরল প্রশস্ত রাস্তা ধরে বাস চলছিল তো চলছিলই, অনেক দূরে দূরে এক একবার দাঁড়ায়—দু'দশজন ওঠে বা নামে। যেখানে বাস থামে সেখানে হয়ত একটা ছোট্ট দোকান নামেই, পাওয়া যায় না কিছুই চা আর পান ছাড়া। ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে ছেড়ে দেয়, হু হু করে দরাজ গতিতে এগিয়ে চলে বাস। দু'পাশের বন সরে যায়। লোকজনের মুখ দেখা যায় না। কোথাও একটা কুকুর অথবা একটা গরু। আর চলে বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাঝে মাঝে পাহাড়—ছোট বড় মাঝারী। এগিয়ে আসে, পিছিয়ে যায়, বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক খায় দূরে, দুধারে সরে গিয়ে রাস্তা করে দেয় কখনও; কখনও বা আবার রাস্তার সামনে অহেতুক দাঁড়িয়ে ধাবমান বাসটাকে একটু ঘুরে পাশ কাটিয়ে যেতে নির্দেশ দেয়। কেউ বা নীলাভ, কেউ বা ছোট বড় গাছে ছাওয়া সবুজ, কারো বা আপাদমস্তক পাকা বাঁশ-পাতায়-কঞ্চিতে মোড়া—সোনার মতোই উজ্জ্বল—কত রকমের রঙ।

তখন দিগ্‌দিগন্তে দুপুরের ঝকঝকে রোদ। দূর থেকে কিংবা দূরের পাহাড়গুলো সব ধোঁয়াটে নীল অথবা মেঘলা। নীল শূন্যে চলমান বর্ষণক্লান্ত মেঘের দলগুলোর দিকে তাকালে সত্যিই মনে হয় অনভিভূতভাবে যে মর্তে ওই মেঘগুলোই বিশ্রাম নেবার জন্য নেমে পড়েছে যার যেখানে খুশী।

সমুদ্র দেখে ফিরছিলাম ভারতের এক বিখ্যাত উপকূল থেকে। তার সেই অশান্ত উদ্বেলতা, দুরন্ত উচ্ছ্বাস, ভৈরব কল্লোলের হুহুঙ্কার সমস্ত মনটাকে দখল করেছিল। বাস থেকে যখন নামলাম তখন মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ। সামান্য দু'পা চলতে গিয়ে নারকোল বনের মধ্যে হঠাৎ বাঁকের মাথায় একটু দূরে চিল্কা চিক্‌চিক্

করে উঠল। কেমন যেন মায়া হলো। 'ইয়ারো' দর্শনের বহু ব্যবহৃত অমলিন উচ্ছিষ্ট প্রথম বিস্ময়-সূচক বাক্যটি মনে এলো সঙ্গতভাবেই কিঞ্চিৎ করুণার সঙ্গে—একী রূপে দিলে দরশন! ঘন নারকোল বনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম খাটো বেঁটে পুষ্ট গাছের সবুজ পাতার ঝালর মাটি স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে। সবুজ ফলের ভারে গাছগুলো যেন আকাশের দিকে মাথা তুলতেই পারছে না। তবু কেন যেন ভাল লাগছিল না—মনে হচ্ছিল নাইবা আসতাম সমগ্রকে দেখে তার অংশটুকুকে করুণা প্রদর্শন করতে—অর্থাৎ মেজাজ আর রেশটুকুকে নষ্ট করতে। তবুও এগিয়ে যাচ্ছিলাম পায়ে পায়ে এই ভেবে যে এলাম যখন তখন দেখেই যাই এক ঝলক্। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার দর্শনের সমস্ত পরিধি জুড়ে নীলাব্জ নীল চিল্কা আমার দৃষ্টি-পথকে বিস্ময়ে ভরে দিল তার সুশান্ত দীপ্তিতে। নরম নাতিশীতোষ্ণ সজল হাওয়া আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপকে সাদর চুম্বনে বিবশ করে দিল। দেখলাম সবটুকু কাঁপছে অপরূপ সুষম তালে—হাল্কা ছোট নীল তরঙ্গের বিভঙ্গে। নিঃখুত নীল ভেলভেটে সে কি মোহন চঞ্চলতা। ব্যপ্ত উপকূলের প্রান্ত সহনীয় নিবিড় আঘাতে অবিরাম স্পন্দিত। একটানা অথচ একঘেঁয়ে নয় এমন একটি বিবাগী সুরের বিস্তারিত রেশ পিছনের জগৎ-সংসার ভুলিয়ে দিল নিমেষেই। মনে হল আমি আর আমার চিল্কা ছাড়া কী বা আর আছে; থাকতেই বা পারে কী? আর মনে হল অনন্তকাল যেন আমি এখানে এই চিল্কার অপরূপ উপকূলে দাঁড়িয়ে আছি। নিবিড় ভোগের সহ্যাতীত আনন্দের সুখে আমি যখন অবশ হয়ে মরে যাচ্ছি তখন সে আমাকে ডাকল তার ভারী চোখের পল্লব তুলে।

ছোট্ট একফালি একটা নৌকোর আশ্রয়ে আমি তখন কাঁপছি তার অনাবৃত নরম কোলের গভীরে। দাঁড় বাইতে হল না—এগিয়ে যাবার কোন সামান্যতম চেষ্টাও কোরতে হলো না। প্রোষিতভর্তিকার পুরুষ

প্রত্যাগমনে যে নির্লজ্জ সাগ্রোৎসাহ আকর্ষণ সেই দুর্বার আকর্ষণে সে আমাকে নিয়ে চলল তার ছোট ছোট ব্যস্ত ঢেউয়ের মৃদুতাড়নে—অনেক দূরে—অনন্ত নীল খেতের মাঝে। তার সেই দুরন্ত প্রয়াসের সাক্ষী রইলেন সর্বদর্শী সূর্যদেব আর পিছনের জগৎটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলো। অলোকসুন্দর সেই অভূতপূর্ব মুহূর্তে মনে হচ্ছিল ওই নীল শান্তির মাঝে মরে গিয়ে একাকার হয়ে যাই। চিল্কা আমায় মাতাল করে দিল, নইলে কি ভাবতে পারতাম যে অনাস্বাদিত স্বাদ মিটাবার জন্যে আত্মহত্যাতেও অপ্রমেয় সুখ আছে। সমুদ্রে, হ্রদে অথবা চমৎকার সরোবরে মাঝে মাঝে কত লোক ডুবে মরে যায়—যার জন্য আমরা হা-হুতাশ করি, সে গুলো কি সবই অনবধানতা না কি অনভিলষিত ? কে জানে। তবু মনে হয়, মনে না হলেও ভাবতে ভাল লাগে যে সব হলেও দু'একটি নয়—নিরুপম শান্তির লালসায় হয়ত কেউ কেউ ডুবে যায় জলের পৈঁঠা বেয়ে গভীরতম অতলতায়—নিরুপদ্রবে।

দৃশ্যমান সমস্ত হ্রদটুকু জুড়ে এই দুপুরের অম্লান রোদে কোটি কোটি নক্ষত্রের দল নেমে এসে খেলা করছে—গা ভাসিয়ে, রাত্রি জাগরণের অপার ক্লান্তি ধুয়ে ঠাণ্ডা হবার জন্যে। এবং আমি সেই তরল আকাশের নীলে মরে না গিয়েও নক্ষত্রদের ভিড়ে যে একাকার হয়ে রয়েছি দেখে বোবার মতো নিশ্চুপ হয়ে বসেছিলাম।

সমুদ্রের সরব মুখরতায় সকলেই মুখর হয়ে ওঠে। কে জানে, হয়ত গর্জনমন্দ্র সমুদ্রের তটপ্রান্তে কোন আজন্ম বোবা মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিলে কথা বলে উঠবে অকস্মাৎ। যদি বলে ওঠে আশ্চর্য হবার নয়, কিন্তু এইখানে চিল্কার নিস্তব্ধ বিষাদের রাজ্যে, যেখানে একটি পরিচ্ছন্ন শব্দহীনতায় পার্থিব রলরোল নিমগ্ন সেখানে কোন ক্ষীণতম মৃদু ভাষণ অসহ্য রূপেই অনভিপ্রেত।

পরিশ্রান্ত জীবনের তালিকায় সাড়ম্বর সুখাবগাহনের এমনতর

অভাবিত দিনও ছিল। আমি আর পারছিলাম না। আমার স্নায়ু-শিরা-উপশিরা-ধমনী-রক্তকণিকা-মজ্জা-মস্তিষ্ক সব কিছু সুখের যন্ত্রণায় টনটন করছিল সেই জলভূমির নির্জন নিকেতনে। তাই মনে মনে বলছিলাম: হে ঈশ্বর, অমেয় প্রাপ্তির স্মরণীয় মুহূর্তে আনন্দোপলব্ধির অংশগ্রহণে আমার হৃদয়টাকে কিছুটা হাল্কা হতে দাও। অথচ এদিকে আমার মাহেন্দ্র-মুহূর্তগুলি ক্রমশই পলায়নপরতায় তৎপর জেনে মুহ্যমান হয়ে পড়ছিলাম প্রাণান্ত অস্থিরতায়।

বিশ্বাস করতে মন যাচ্ছিল না যদিও, তবু বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না যে এক দুঃসহ ভয়াবহ বিষণ্নতা ধীরে ধীরে আমাকে আক্রমণ করছে। সেই সুস্থির পর্যাপ্ত আমেজের অচঞ্চল পরিমণ্ডল যে কোন মানুষকে সত্যিই উন্মাদ করে দিতে পারে—সম্পূর্ণভাবে।

প্রচলিত হ্রদের সংজ্ঞায় চিল্কার পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও আসলে সে সমুদ্রেরই শরীর। সমুদ্র হয়েও যে সামুদ্রিক গৌরবের সৌগন্ধে বঞ্চিত, অর্থাৎ যে সমুদ্র হতে পারল না সকলের চোখে, তার অন্তরাত্মা যে অভিমানে মলিন হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই সে শুয়ে শুয়ে ভাবে আলস্যের জড়তায় সারাদিনমান তার অভিশপ্ত জীবনের গ্লানির কথা। সেই জন্যেই বুঝি, যে কেউ আসে যদি কখনও ৺ র রাজ্যে, অমনি সে :নিয়ে যেতে চায় সেইখানে যেখানে সে হ্রদের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ নয়—অকূল পারাবারের সীমাহীন বিস্তারে লীন।

সূর্য অস্ত গেল চিল্কার সীমান্ত প্রহরী শৈলচূড়ার গভীর অন্তরালে। বিস্ময়ের আকস্মিতায় অবাক হয়ে গেলাম। ম্লান আলোর পরিবর্তিত পটভূমিকায় সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল—নিমেষেই। এক একটি করে নির্বোধ সময়গ্রন্থি পার হতে লাগল বৈচিত্র্যহীন দৈর্ঘে। পুঞ্জীভূত অভিযোগ উদ্বেল হল সূর্যের হৃদয়হীনতায়। অধমের অসম ব্যবহার অভাবিত নয় কিন্তু মহতোমহীয়ান যিনি, তাঁর অনুগ্রহ বণ্টনে অপক্ষ-পাতিত্বের অনুপস্থিতি অকল্পিত। উজ্জ্বল করপ্রভা গ্রহণে যে জলাধার

সমুদ্রের মতোই সমঅংশীদার কেনই বা সে অস্তগমনের অনুপম বিভব বিতরণের কালে বঞ্চিতের মতো অবমাননায় মুখ নামিয়ে থাকবে।

এবং ঠিক তখনই আরেকবার জেনে ক্ষমা চেয়ে নিলাম যেমন অনেকবার চেয়েছি আমি আমরা সকলে—সকলের হয়ে, অনেক ক্ষেত্রের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের হাস্যকর ভ্রান্তির স্বরূপ দর্শনে—লজ্জায় অধোবদনে হয়ে। ক রণ মুখ তুলতেই দেখলাম নীলিম দিকচক্রসীমার অসীম অর্ধবৃত্তের সকল অবয়বে ফাগের বিচূর্ণগুঁড়ো রঙ ছড়াচ্ছে চিকন প্রলেপে। আর দূর-দূরান্তে আমার দৃশ্য জগতের বাইরে একটু একটু করে একটি একটি করে কোথাও যেন অপার্থিব কনক পারিজাত তাদের রঙীন পাপড়ি মেলে দিচ্ছে অনবরত, যাদের পরাগকেশর থেকে মুঠো মুঠো সোনার আবীর ঝরে পড়ছে উড়ে উড়ে এই বিকেলের প্রশান্ত বাতাসে—হ্রদের গর্ভে। —'চিল্কা-হ্রদের নীল জলে লাল আবির ঝরে'— কিন্তু কতক্ষণ ? যতক্ষণ না 'সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের',। তারপর দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে গোলাপী রক্তাভ থেকে ঘন হলদে জাফরান হয়ে সম্পূর্ণ সোনার আপেলের মতো হয়ে না উঠল—ঠিক ততক্ষণ। চিল্কার জল তখন অকৃপন দানের বৈভবে তরল টলটলে সোনার মতোই নয়নাভিরাম। আমার হাতের তালুতে নেওয়া জলটুকুও স্বপ্নময় স্বর্ণাভ বিভাসে উজ্জ্বল। ঈশ্বর, স্বর্গের বিকেল কী এর চেয়েও মনোরম ? যে আমার সমস্ত দেহ জাগতিক অযুত ব্যর্থতায় ধূলিধূসর সেও যে স্বর্ণকান্তি দেব-দেহ হয়ে উঠল এই সোনার তরীর গলুইএর দেবী পাটাতনে !

যে বিকেল অবসরের অভাবে উপেক্ষায় চিরদিন অনাদৃত তার এই অনাবৃত রূপের গভীরে এত রঙ এত সম্পদও ছিল। জীবনের জ্বলজ্বলে সূর্যটা সেদিন হঠাৎ ডুবে গিয়ে সব রঙ ঢঙ চারুকলা এক পোঁছ কালোয় আচ্ছন্ন করে দেবে সেদিনও যেন অন্য জগতের যাত্রার পথিক এই আমার যাত্রাপথ চিল্কার বিকেলের অবিস্মরণীয় প্রসন্ন

আলোকধারায় দীপ্যমান হয়ে ওঠে। নির্জন নিঃশব্দ উপভোগের আরামে যদি কেউ বুঁদ হতে চান কোনদিন, তবে আসবেন এই চিল্কার মধ্যবর্তী পাহাড়ী দ্বীপের ওপর পা ছড়িয়ে বসতে। কোন যান্ত্রিক গুঞ্জরণ অথবা আর্তনাদ নেই। সুন্দর যে কত শান্ত ও সমাহিত আর তার প্রতিপালিকা যে কত আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে আরো সুন্দরতর করতে সাহায্য করছে—সে কথা বলার নয়।

যে জগৎ আমাকে কর্মে-ঘর্মে-কোলাহলের নারকীয় যন্ত্রণায় পিশে ফেলছে প্রতিদিন তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে—নিজের আত্মাকে নিয়ে কোনমতে পালিয়ে এসে যে অসামান্য উল্লাসের তরঙ্গে সামান্যকালের জন্য ডুবিয়ে রাখলাম নির্ভাবনায়—সমস্ত ব্যস্ততার কণ্ঠনালীকে চেপে ধরে হেলায় ডঙ্কা মেরে ভেসে বেড়ালাম খেয়াল-খুসী মতো বেহিসেবী হয়ে, তার জন্যে সে শোধ তুলবে অকরুণ নির্মমতায়। তবু সান্ত্বনা এই—বলীয়ান আনন্দের অমৃত পানে অন্তত একটি দিনের জন্যেও গৃহীত আনন্দের সুখে আমি স্পর্ধিত।

যেহেতু আকাশে সূর্য অথবা চাঁদ কিংবা নক্ষত্র নেই সেই জন্যেই মনে হলো বেহুইন সময়ের ক্যারাভান বুঝি অনেকক্ষণ ক্লান্ত হয়ে থেমে আছে এই ম্রিয়মান রাঙা আলোয় আলোকিত প্রাক্‌সান্ধ্য প্রহরে। গতিহীন সময়ের সেই চূড়ান্ত বিপদগ্রস্ত দূরবস্থা সত্যিই উপভোগ্য। অনেকক্ষণ ধরে সেই নির্জন রাজ্যের বাসিন্দা হয়ে পড়েছিলাম বলেই নাকি জানি না মনে হচ্ছিল—আমি বুঝি কোনদিনই শুনতে পাইনা কিছুই। চেতনার এরিয়েলে এই ভাবনাটি যেই ধরা পড়ল অমনি আমি ভয়ে কাতর হয়ে পড়লাম। আর অনেকক্ষণ যখন শ্রবনেন্দ্রিয়কেই নয় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে, সজাগ করে কিছু শুনবার চেষ্টা করলাম গভীর উৎকণ্ঠায় অথচ কোন শব্দ বা শব্দের ঘ্রাণ ভেসে এলো না তখন স্বভাবতই নিজেকে বধির বলে মনে হল। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না যে এখন চিল্কার ভূগোলের যাবতীয় শব্দ ছুটি নিয়ে চলে

গেছে সমুদ্রের গর্জনকে আরো গর্জনমুখর করে দিয়ে আসতে। সব কিছু বুঝেও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তাই মনে হচ্ছিল ভীষণ শব্দের উচ্চনাদ উঠছে আর আমিই শুধু শুনতে পাচ্ছি না। সেই ধারণাই হয়ত আমাকে একেবারে অনেক অসুস্থ করে তুলত, যদি না—আহা, অশ্রুতপূর্ব ধ্বনিটুকু আমার কর্ণ পটহে মৃদু তরঙ্গে এসে আঘাত করে ধীরে ধীরে বাগীশ্বরী দ্যোতনায় ছড়িয়ে পড়ত জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। প্রথমে অনেক দূর থেকে একটি আওয়াজের আয়োজন ছড়িয়ে পড়তে লাগল—কুয়াশার মতো। তাকিয়ে দেখলাম হাঁস আসছে, জ্যামিতিক বিন্দুর আভাসে একটি গতিময় তরল রেখায়। ওদের পক্ষে সঞ্চালনের দ্রুত তালে বিপন্ন নিস্তব্ধতা শব্দ তুলছে—শাঁই শাঁই করে—ঠিক শব্দ নয়, শব্দের আত্মার অনুরণিত প্রতিধ্বনির স্পন্দন মাত্র। খুব উঁচু দিয়ে ওরা দ্রুত গতিতে উড়ে যাচ্ছে কলরোল কলহাস্যে কলস্বনা একটি নদীর ভগ্নাংশের ক্ষীণতায়। আর সে কী অবিরাম কলকল ধ্বনি। অদৃশ্য সূত্রে গাঁথা মালার মতো নয় গানের সূত্রে গ্রথিত গীতিমাল্যের মত ওই সাগর-বিহঙ্গেরা কোন শৈলাবাসের অপেক্ষায় চলেছে, চলেছে ···এক, দুই,-তিন, চার অজস্র অপার।

পিছে যদি কেউ পড়ে থাকে, পাছে কেউ দিকভ্রান্ত হয়ে হারিয়ে যায়, নাকি স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে জানি না ওরা ডাকাডাকি করে গান করে করে চলল এক একটি সারিতে একই দিকে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নেমে পড়বে ঝাঁকে ঝাঁকে। যেখানে নামবে সেই গোটা পাহাড়টা অনেকক্ষণ ওদের কলকলানিতে ভরে যাবে। কালো কালো ছিট্ দেওয়া বাদামী অথবা সাদা পাখীগুলো ভর্তি পেট নিয়ে থপ্ থপ্ করে ঘোরাফেরা করবে লম্বা লম্বা গলাগুলোকে বাড়িয়ে কমিয়ে আর খানিকক্ষণ পরেই আহারের তৃপ্ততায় ও ক্লান্তির অবসন্নতায় একটা ঠ্যাংয়ের ওপর অথবা বুকের ওপর ভর করে মখ্‌মলের মতো পালকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বে

জ্যোৎস্নালোকে অথবা অন্ধকারের মশারীর ভেতর। সেই ইঙ্গিত আরাম ও প্রগাঢ় শান্তির কোলে বিশ্রাম নেবার জন্যেই ওরা হাওয়ার সমুদ্র সাঁতরিয়ে চলেছে তো চলেছেই—অবিশ্রান্ত গতিতে।

তারপর ওরা মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। সেই তিরোভাবের পরও অনেকক্ষণ একটি স্বর্গীয় সিম্ফনির রেশ বৃত্তাকারে ঘুরপাক খেতে লাগল সুস্থির আবেগে করুণ হ্রদের জলে, আবছা পাহাড়, ম্লান দিগন্ত আর আমার অভিভূত হৃদয়টাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

রচনাকাল: ১৯৫৯

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

জীবনের প্রান্ত সীমানায় এসে রবীন্দ্রনাথ চিত্র রচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। হিসেব মতো ধরতে গেলে ১৯২৬ সাল থেকে অবশ্যই ধরতে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুর দশ বারো বছর আগের সময়টাই তাঁর চিত্র রচনার উল্লেখযোগ্য কাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় তিন হাজার ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথের সব ছবি একত্রে দেখতে পাওয়া অসম্ভব। তবে বেশ কিছু সংখ্যক ছবি শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র ভবনে' যত্নের সঙ্গে রাখা হয়েছে।

প্রথম তিনি তাঁর নিজের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন ১৯৩০ সালের ২রা মে, প্যারিসে। মোট একশ পঁচিশ খানা ছবি সেখানে টাঙানো হয়। এর পর কবির জীবিতকালে লণ্ডনে (৪ঠা জুন, ১৯৩০), কোপেনহেগেনে (৯ই আগস্ট, ১৯৩০) মস্কাওয়ে (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০), ন্যুয়র্কে (অক্টোবর, ১৯৩০), কলকাতার টাউনহলে (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩১), কলকাতা আর্ট স্কুলে (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২), সিংহলে (১১ই মে, ১৯৩৪), মাদ্রাসে (২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৪), তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় এবং শিল্পরসগ্রাহী ব্যক্তিরা রবীন্দ্র-চিত্রকলা সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

রচনা সংশোধন কালে কাটাকুটির জঞ্জাল ভেদ করে যে সব জটিল নক্‌সা ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছিল, ক্রমে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মনে ভিন্ন এক বাসনাকে জাগ্রত করে। তারই ফলশ্রুতি রূপে পাই পার্থিব অপার্থিব কত জন্তু-জানোয়ার, মুখ, গাছ-গাছালি, নিসর্গ প্রভৃতি বিচিত্র শিল্প সম্ভার। এই শিল্প সৃষ্টি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মোটেই প্রথা সিদ্ধ মসৃন রাস্তা ধরেননি। যদিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের মতো চিত্রশিল্পীরা তাঁরই পাশে থেকে চিত্র অঙ্কনের

মাধ্যমে তাঁর চিত্র অঙ্কন প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে, তথাপি তিনি চিত্র অঙ্কন করেছেন য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে, কিন্তু য়ুয়োপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখলে একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না যে, তিনি পুরোপুরি ভাবে বিদেশী চিত্র-চর্চার ক্রমবিকাশের ধারাটি অবলম্বন করে চিত্রাঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফলে বিদেশী সমালোচক গোষ্ঠী তথা জন সাধারণ এক কথায় তাঁর চিত্র সম্বন্ধে রায় দিতে গিয়ে নিজেদেরকে অসহায় বোধ করেছেন। উজ্জ্বল রঙ, সুডৌল রেখায়, ঝরণা-কলমের বিশৃঙ্খল আঁচড়ে, ভুষো কালিতে আঙুল ডুবিয়ে আপাত দৃষ্টিকটু অপরূপ চিত্র রচনায় রবীন্দ্রনাথ চিত্র জগতে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তৎকালীন বিদগ্ধ জন-মণ্ডলীর কেউ কেউ তাকে 'কালাপাহাড়ী' আক্রমণ বলে মনে করলেন। অনধিকার চর্চার অপপ্রয়াসের নিদর্শন স্বরূপ এগুলি অনেক ক্ষেত্রে নিন্দিত হলো। তবে স্বীকৃতি লাভ যে করেনি তা নয়, পরবর্তী কালে অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীরা কবির এই নব প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

বস্তুতপক্ষে যদি এ কথা ভাবা যায় যে রবীন্দ্রনাথের শিল্প সৃষ্টির প্রচেষ্টায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং সর্বোপরি তাঁর অসামান্য কল্পনা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি একত্রিত হয়ে কাজ করেছে তাহলে হয়তো তাঁর চিত্রগুলি আমাদের সামনে কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেবে। প্রথম দিকে তাঁর ছবিগুলি দেখে এ ধারণা করা অস্বাভাবিক নয় যে কলমের মুখ-নিঃসৃত রেখাগুলিই ক্রমশ একটা আকার অবলম্বন করে পরে রূপ-সৃষ্টির উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে বেশ কিছু ছবি যে তিনি আঁকার জন্যই আঁকতে বসেছিলেন গভীর আগ্রহে, সে কথার সাক্ষ্য বহন করবে তাঁর অনেক চিঠিপত্র, কবিতা ও নিবন্ধাদি।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে তাঁর আঁকা ছবি দেশের লোকের কাছে

বোধগম্য হবে না। যে দ্বন্দ, সংঘাত ও মতবাদের প্রবল কল্লোলধ্বনি পশ্চিমে সাড়া তুলছিল, হয়ত সেখানেই কোন নতুন মূল্যে তাঁর ছবির মূল্যায়ন হবে—একথা ভেবে নিজ চিত্রগুলিকে 'পশ্চিমের হাতে দান করেছি' এ রকম একটা অভিমানমিশ্রিত বেদনা ঘোষণা করেছিলেন।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার প্রদর্শনী পশ্চিমের নানা দেশে হলেও কোন নির্দিষ্ট নামানুসারে সেগুলি চিহ্নিত হয়নি। দলছুট এই চিত্রশিল্পীর রচনাগুলি তাই অনেকের কাছে প্রাচীন কালের গুহাচিত্র, খ্যাতিমান বিশ্বকবির খামখেয়াল, অবসর বিনোদনের সামগ্রী অথবা ঐশ্বরিক অবদানের সংজ্ঞায় বাঁধা পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তিনি এমনই এক মনীষী, যিনি অনায়াসে বিভিন্ন ভাবধারাকে স্বচিন্তায় সুস্থ ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে জারিত এবং আত্মস্থ করে নিজস্ব মননের বিকাশে কাজে লাগাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এ কথাটা বুঝতে না পারার দরুন তাঁর পঠন-পাঠন, চিন্তা, ধ্যান, জ্ঞান, অনুকরণ, ইতিমধ্যেই এক কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে।

এই অতি সজ্ঞানী শিল্পী য়ুরোপীয় শিল্পের এ্যাবষ্ট্রাক্ট ধর্মীয় শিল্প-চেতনা, কিউবিজম্, দাদাইজম্, এক্সপ্রেসনইজম্, ফবিজম্, প্রিমিটিভিজম্, ফিউচারইজম্, ইমপ্রেসনিজম্, পয়েন্টালিজম্, স্যুররিয়া-লিজম্, সিম্বলিজম্ প্রভৃতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। অথচ তাঁর চিত্র প্রয়াসের নমুনাগুলিতে দৈবাৎ প্রকট ভাবে কোন 'বিশেষ পদ্ধতির' অনুকৃতি পরিলক্ষিত হয়। য়ুরোপ ভ্রমণের বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশেষ করে চিত্র রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। এই একটি ক্ষেত্রে স্বদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় শিল্প-বোধের চেতনা তাঁকে প্রভাবান্বিত করে অবিশ্বাস্যভাবে। অবশ্য সঙ্গীতেও সুর সৃষ্টির কোন কোন ক্ষেত্রে দেশীয় রাগ রাগিনীর সঙ্গে বিদেশীয় সুরের অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে একটা মহান বৈশিষ্ট্য দান করেছে। যদিও তিনি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে

ভ্রমণকালে জীবনের বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছেন, অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, লোকজন, রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তা সত্ত্বেও গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ক্বচিৎ কখনো বিদেশী কোনো ঘটনা, ভাব, বর্ণনা সে সমস্তকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। নৃত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের পদ্ধতি কোথাও কোথাও প্রভাব বিস্তার করেছে রবীন্দ্র-নৃত্যে। তাহলে দাঁড়ালো সঙ্গীতে, নৃত্যে সামান্য কিছু তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। যথোপযুক্ত বিকাশকল্পে গ্রহণীয়কে গ্রহণ করেছেন স্বাভাবিক বিমুগ্ধতায়। কিন্তু অপ্রয়োজনের তাগিদে স্বেচ্ছায় তিনি য়ুরোপীয় চিত্রাদর্শকেই বরণ করলেন কেন—এ এক বিস্ময়কর প্রশ্ন। কেবলমাত্র তাই নয় বিচারপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন তাঁদেরই সামনে। এই নিবন্ধের প্রথম ভাগে উল্লিখিত চিত্র প্রদর্শনীর স্থানগুলির দিকে তাকালেই সে কথা স্পষ্ট হবে। বিদেশীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়ে তিনি অবশ্য দেশেও কিছু কিছু জায়গায় চিত্রাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রবল অভিমানী রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশীয় জনসাধারণের অবহেলিত মনোভাব হয়ত তাঁকে বিড়ম্বিত করে থাকবে।

যেদিকেই তিনি পদক্ষেপ করেছেন সেদিকেই এ[illegible]ছে প্রভূত অক্ষম সমালোচনা, হৃদয়হীন কটূক্তি, আর তারপর যেই তার স্বীকৃতি পাশ্চাত্য মনীষীরা দিয়েছেন অমনি স্বদেশীয়রা সমস্বরে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন। এটি তাঁর কাছে একটি স্বতঃসিদ্ধের মতোই হয়ে গিয়েছিল। তাই অযথা কালহরণ না করে প্রায় সত্তর বছর বয়সে তিনি সরাসরি য়ুরোপীয় মনীষীদের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে এলেন। স্পষ্টই তিনি বুঝেছিলেন যে খেয়ালখাতার পাতাতে আঁকিবুকি করতে গিয়ে যে রূপ ক্রমশ ধা[illegible] করছে, তা তাঁর দেশের কোন বিশিষ্ট শিল্প সরণি ধরে উপস্থিত হচ্ছে না, পরন্তু য়ুরোপীয় চিত্রাদর্শে সেগুলি বিজাতীয় ঘ্রাণে সমৃদ্ধ।

প্রতিবেশিনীর কাছে

চিত্রশিল্পীদের জগতে অশিক্ষিত শিল্পীদের যে আবির্ভাব হয় না তা নয়, বরং হঠাৎ শিল্প সাধনায় কেউ কেউ নেমে পড়ে একেবারে পাকা আসন করে নিয়ে পৃথিবীতে সুখ্যাত হয়ে গেছেন। অন্তরের প্রবল তাড়নে তাঁরা শিল্পাঙ্কনের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্যারিসের কাষ্টমস্ অফিসর হেনরী রুসো সরকারী চাকুরী-জীবনের মেয়াদকাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রাঙ্কনে নেমে পড়ে ঝানু চিত্র সমালোচকদের বিব্রত করে তোলেন। পল গোঁগা, ভ্যান গ্যগ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত শিল্পীরাও কোন 'স্কুলের' মধ্য দিয়ে শিল্প জগতে প্রবেশ করেননি। তাই যে রবীন্দ্রনাথ 'একটা দেশলাই বাক্স আঁকতে পারেন না' বলে সমালোচিত হয়েছিলেন, তাঁর শিল্প-সৃষ্টি যে নেহাৎই বুড়ো বয়সের ভীমরতি একথা ভাবা অবান্তর। কোন শিল্পী কোন বয়সে কী ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন, এ সব প্রশ্নও অপ্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি যদি অবলোকন করা যায়, তবে প্রথমেই আশ্চর্য হতে হয় তাঁর রেখার প্রয়োগ দেখে। সরল, বক্র, সুললিত, অসংস্কৃত রেখাগুলি চিত্র বিশেষকে একটি সামগ্রিক চরিত্র দান করেই রেহাই দেয়নি, গতিশীল ও প্রাণময় করে তুলেছে। দুর্বার আগ্রহে তিনি চিত্র অঙ্কন করতেন। তুলি নেই আঙুল আছে; রঙ নেই, ফুলের রস আছে; কাগজ নেই, কাপড় আছে—অর্থাৎ আঁকাটাই মুখ্য, অন্যান্য গৌণ। তাতে হয়ত শিল্পীর স্থৈর্য নেই, সমাহিত ভাব নেই, সংযম নেই আছে শুধু প্রকাশের মহতী বাসনা, অবশিষ্ট আয়ুর স্বল্পতাকে উপলব্ধি করে প্রাণপণে অঙ্কনের ব্যাকুল মনোবাসনা।

তাঁর দুটি চোখের তারায় বিশ্ব জগতের অনির্বচনীয় রূপ ধরা পড়ত—গানে, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে—তিনি সংস্কৃত, পরিশীলিত, অভিজাত। রবীন্দ্র-চিত্রকলার জগতে কিছুক্ষণ বিচরণ করলে দেখা যাবে সেই লক্ষ্যনায় পারিপাট্য অধিকাংশ

স্থলে অনুপস্থিত। অথচ এটা ইচ্ছাকৃত নয়। হুইটম্যানের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যা বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্পর্কে যদি সে কথা কয়টি উল্লেখ করি, তাহলে বোধ হয় অশোভন বা অসঙ্গত হবে না।

'প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছু নির্বিচারে মিশোল আছে, এ রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন —আদিম কালের বসুন্ধরায় সেটা ছিল—তার কারণ তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড। ···জাগতিক দৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংগঠন আছে, এ সেই রকম। ছন্দোবদ্ধ সব লণ্ড ভণ্ড—মাঝে মাঝে এক একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে ওঠে আবার যায় মিলিয়ে। সেখানে কোন যাচাই নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্ব-স্থান। ···এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে, এই জন্যে সাহিত্য এর জুড়ি নেই—মুখরতা অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়া দরকার।'

রবীন্দ্র-চিত্রকলায় রঙের স্থান একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে। সে রঙ কোমলতার অপেক্ষা তীব্রতার দিকেই ঝোঁকে বেশী। শিল্পীর একান্ত ইচ্ছাটি যেন আদিম রঙের উজ্জ্বলতার সঙ্গে সমান্তরাল। বিষয় নির্বাচনে অবাধ, রঙ ব্যবহারে উদ্দাম, অঙ্কন আরম্ভের পর সমাপ্তির দিকে দৌড়াবার প্রয়াসে ক্লান্তিহীন—রবীন্দ্রচিত্রের বৈশিষ্ট্য। কখনও সেগুলি স্ট্যাটিক—প্রাণহীন, রক্তশূন্য, নির্বিকার; কখনও প্রচণ্ড রকমের ডিনামিক—আবেগ-স্পন্দিত অথচ নির্লিপ্ত। কখনও বিস্ফারিত-বিস্ময়ে অসহায়, নচেৎ প্রসন্ন নয়নাভিরাম অভিব্যক্তিতে রমন্য। টেম্পেরা, চাইনিজ ইঙ্ক, ফাউন্টেন পেন ইঙ্কের দ্বারা রচিত চিত্রগুলির এমনই একটা মহৎ গুণ আছে যে, যে কোন শিল্পরসিক যদি সেগুলি জোর

করেও নাকচ করেন, তাহলেও তারা ব্যক্তিমানসে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথ চিত্রগুলির নীচে কোন নাম দেননি, সেজন্যই উদাহরণ সংযোগে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর অঙ্কিত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ঠোঁট বিহীন হয়েও সুন্দরী মহিলা, চামড়ার ওপর ছিটে-ফোঁটা রঙের সংযোগে গঠিত মূর্তি, সবল মোরগ, জন্তুর মুখ, ষ্টীল-লাইফের অনুসরণে চিত্রনিচয় এবং মিষ্টিক অন্যান্য রচনাগুলি দর্শক সাধারণকে ভিন্ন এক বোধের জগতে অনায়াসে নিয়ে যায়। তাঁর সৃষ্ট স্কেচগুলিতে কার্টুনের একেক্ট দেখতে পাওয়া যায়।

ভাসমান চলন্ত মেঘমালার দিকে তাকিয়ে অথবা দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন আকৃতির যে সব প্রায়-মূর্তি গড়ে ওঠে সময়ের নিজস্ব আঁচড়ে, রবীন্দ্র-চিত্রকলার অনেক চিত্র দেখে সেই সব গড়ে উঠতে উঠতে মিলিয়ে যাওয়া অথবা মিলিয়ে যেতে যেতে গড়ে ওঠা চিত্রের উপাদানের কথা চিন্তা করা বেমানান নয়।

'সে' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থকে প্রতিষ্ঠিত করবে। 'দূরে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওৎ পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তুলি বাগিয়ে এই সব এঁকে চলেছি।'

রবীন্দ্রনাথের সহজাত গ্রহণ ক্ষমতার কাছে প্রকৃতি নিবিড় ভাবে ধরা দিয়ে তাঁর মানস প্রকৃতি গঠনে অত্যন্ত শৈশব হতেই চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, এবং আমরা দেখেছি প্রকৃতির এই প্রয়াস কী বিস্ময়কর সফলতাই না লাভ করেছে।

রবীন্দ্র রচনায় সুন্দরের স্থান সর্বাগ্রে। কী ব্যক্তিগত জীবনে কী সাহিত্যে, জীবনের কোন পর্বে তিনি অসুন্দরকে স্থান দেননি—

একমাত্র এই চিত্রের ক্ষেত্র ছাড়া। ছন্নছাড়া, বিসদৃশ, উৎকট চিত্রগুলি (অবশ্যই সবগুলি নয়) দেখে কেউ যদি ভাবেন যে, যে অসুন্দরকে তিনি সারাজীবন অতি সতর্কতার সঙ্গে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন নিতান্ত :অপরিহার্যভাবে তারা অবচেতন মনের অতলতা থেকে মূর্তিলাভ করেছে এবং রবীন্দ্র প্রতিভার একটা সম্পূরক হয়ে দেখা দিয়েছে, তাহলে কিন্তু খুব ভুল বলা হবে না। তবে রবীন্দ্র-চিত্র দর্শনকালে একথাটি সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে তিনি শিব গড়তে বাঁদর, অথবা বাঁদর গড়তে গিয়ে বাঁদরের ফটো আঁকেননি। তিনি ছবি আঁকতে গিয়ে ছবি এঁকেছেন, যার ফলে একটা কিছু বক্তব্য ফুটে উঠেছে। তবে সে বক্তব্যটি যে কী, এবং শিল্পীর বক্তব্য যে অনড় বেদবাক্য একটা কিছু নয়, একথা বোঝবার জন্যেই তিনি চিত্রের পায়ে নামের বেড়ী পরিয়ে দেননি। তিনি লিখেছেন, 'ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি। আমি কোন জিনিষ ভেবেআঁকিনি—দৈবক্রমে কোন অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতিকলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনকরাজার লাঙলের ফলকের মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিকের নাম দেওয়া সহজ ছিল···আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত ভাবে এসে হাজির···।'

অথবা

'I need not formulate any doctrine of art but be contented by simple saying that in my case pictures did not have their origin in trained discipline in tradition and deliberate attempt of illustration, but in my instinct for rhythm my pleasure in harmonious combination of lines and colour.'

নতুন যুগের চিত্র-শিল্প-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যদিও তিনি ভাবতেন যে একমাত্র শব্দের বেড়াজালেই ঘুরপাক খেতে হবে, ও

রাজ্যে যাবার প্রবেশপত্র তাঁর নেই তা সত্ত্বেও ছবি আঁকার বিষয়ে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এক পত্রোত্তরে জগদীশচন্দ্রকে লণ্ডনে (৩১শে আগষ্ট, ১৯০০) চিঠি দিচ্ছেন, 'শুনে আশ্চর্য হবেন একখানা Sketch Book নিয়ে বসে বসে আঁকচি। বলা বাহুল্য সে ছবি আমি প্যারিস সেলোন এর জন্য তৈরী করছিনে এবং দেশে ন্যাশন্যাল গ্যালারি যে এগুলি স্বদেশে ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এ রকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিৎ ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভালো আসেনা সেইটির উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম একেবারে ষোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেব তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী রবার চালাতে হচ্ছে, সুতরাং ঐ রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। অতএব মৃত র‍্যাফেল তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরে থাকতে পারেন, আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।'

চল্লিশ বছরে যতই হাল্কাভাবে ছবি সম্পর্কে বলে যান না কেন, মৃত্যুর তিন মাস আগে (২৫শে মে, ১৯৪১) এবং দু'মাস আগে (৭ই জুন, ১৯৪১) যামিনী রায়কে লেখা চিঠি পড়লে বোঝা যায়, পরবর্তীকালে তিনি ছবির বিষয়ে কী পরিমাণ সিরিয়াস হয়ে উঠেছিলেন। আর বিদেশে ও ভারতের বিশিষ্ট স্থানগুলিতে তাঁর চিত্র প্রদর্শনী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টিই শুধু করেনি, সযত্নে কবি-কৃত চিত্র বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সসম্মানে রক্ষিত হয়েছে এবং যার মূল্য চিত্র হিসেবে পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ হয়ে উত্তরোত্তর আগ্রহ বাড়িয়ে চলেছে।

রচনাকাল: ১৯৬৬

ধার করার সপক্ষে

শুধু মাতাল বলেই নয়, যে কোন নেশাখোর ব্যক্তি একবার না একবার প্রতিজ্ঞা না হোক, চেষ্টা করেছেন নেশা ছেড়ে দেবার—ঠিক সেই রকম এই ধার করার ক্ষেত্রেও। ধার যাঁরা করেন তাঁরাও অনেকবার ভেবেছেন যে আর ধার করবেন না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা ধোপে টেঁকেনি। 'ঋণ করেও ঘি খাওয়া উচিত'—চার্বাকের জয় হোক। আমারও তাই মত, তবে শুধু ঘি নয় যা পাওয়া যায় তাই খাওয়া শুধু নয়, খাওয়া পরা যাবতীয় জিনিষ করা উচিত। এক-শ্রেণীর বিজ্ঞজনেরা বলেন ধার করা মোটেই উচিত নয়। তাঁদের কথা শুনলে মনে হয় পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমি যেন বাঁধানো বিজ্ঞাপন দেখছি—'কভু না করিও ঋণ' অথবা সেই বিখ্যাত উক্তি 'আজ নগদ কাল ধার।' অথচ কালকের প্রশ্ন উঠছেই না। কাল যে আমি যথারীতি থাকব এমনটি তো না হতেও পারে। তাই বলি, মানে ধার করেই বলি ওমর খৈয়াম থেকে, 'Ah take the cash in hand and waive the Rest'.

ধার করে পাওনাদারের হাত থেকে পিছলে পিছলে পালিয়ে যেতে না পারলে বুদ্ধি মোটেই ধারালো হয় না বলেই আমার ধারণা। স্বদেশ বিদেশের কত মহারথী ধার করে আকণ্ঠ ঋণের হ্রদে ডুবে থাকতেন তার কী ইয়ত্তা আছে। তা সত্ত্বেও তাঁদের সুনামের কী কোন ঘাটতি হয়েছে? বরং আরো খোলতাই হয়েছে। তবে আপনি আমি কেনই বা ধার করার মহা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবো। ধন্য সেই মহাপুরুষ যিনি সর্বপ্রথম ধার করার কৌশল আবিষ্কার করেন। এই যে বলা হয় আমি কারো ধার ধারি না—এটা কি সত্যি—সর্বৈব মিথ্যে। এমন লোক তো দেখি না যিনি জীবনে

অন্তত একবার না একবার ধার করেছেন—কম বেশীর কথা বললে বিশ্বাস কোরব। ধার-প্রথা আছে বলে কত লোক করে খাচ্ছে। কাবুলিওয়ালাদের কথা ধরুন। কী সদাশয় বলুন তো। সেদিন এক কাবুলির সঙ্গে মোলাকাৎ হলো। বলল—'বাবু কুছ্ খাতক কোরিয়ে দিন চেনা শোনা'। আহ্‌হা, স্বয়ং ঈশ্বর যেন রাস্তায় নো'রা কোর্তা চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! আগুন, ঋণ আর শক্রর শেষ রাখতে নেই—শাস্ত্রের নির্দেশ। ওসব পুরোনো নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে আসুন আমরা দলে দলে ধার করতে বেড়িয়ে পড়ি।

ধরুন একখানি চমৎকার বই রাস্তার ফুটপাতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে, যার দাম কম করে কত নির্ণয় করা অসম্ভব—কেননা টাকা দিলেও সে বই পাওয়া যায় না, এমন অবস্থায় মাত্র এক টাকার বিনিময়ে সেটি যদি হস্তগত কোরতে গিয়ে দেখেন পকেট গড়ের মাঠ, তখন যদি কাছাকাছি কারও কাছে ধার করে বইটি না কেনেন তা হলে জানবো আপনি একটি অমানুষ—নরকেও আপনার ঠাঁই হবে না।

একটি কথা সর্বদাই মনে রাখবেন, ধার করবার সময় কোন রকম ভনিতা করবেন না। স্রেফ্ বলে ফেলবেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে। তারপর যাই হোক বগলদাবা করে তার কাছেই কিছুক্ষণ বসে তারই পয়সায় কিছু খেয়ে 'ওটা নেকসট্ মান্থেই ক্লিয়ার করে দেবো' এই মিথ্যে ভরসা দিয়ে গম্ভীর ভাবে ফুটপাতে নেমে যাবেন। ধার করার আগে কোন কিছু মোটেই ভাববেন না। সুদখোর 'শাইলক' এর হাত থেকেও শেষ মুহূর্তে পার পাওয়া যায় ভাগ্য যদি প্রসন্ন থাকে।

ধার করতে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়। কোন বাঁধা ধরা নিয়মে ধার করা চলে না। বেশ মোটা রকমের ধার করতে হলে ক'দিন আগের থেকে যাঁর কাছে ধার করবেন তাঁর কাছে যেতে হবে, দরকার হলে দু'চার পয়সা খরচ

করে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বকে আবার বেশ তাজা করে তুলতে হবে। তিনি যেন ঘুনাক্ষরেও আপনার অভিপ্রায় বুঝতে না পারেন। আপনার অবস্থার দীনতা ঢাকবার জন্য প্রয়োজন বোধে আদ্দির পাঞ্জাবী চাপিয়ে গেলে ফল ভাল হবে। বেশ যখন ভাব ভালবাসা জমজমাট হয়ে উঠবে তখন ঝোপ বুঝে কোপটি মারবেন দক্ষ জহ্লাদের মতন—দেখবেন এক কোপেই ফর্সা। মুখে বলবেন—বোধ হয় খুব অসুবিধে হবে এতগুলো টাকা আটকে পড়ে থাকায়, যাই হোক আমি যতক্ষণ না শোধ দিতে পারছি ততক্ষণ স্বস্তি থাকবে না। বলতে শুনবেন—এ কী কথা; আমি তো তা বলিনি। অত কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন কী? আমি কী আর টাকা কটার জন্য মারা যাব? ইত্যাদি ইত্যাদি যত বলে যাবে আপনিও তত বিনীত হবেন ফলের ভারে নম্র নত বৃক্ষের মতন।

ঋণ করে পারতপক্ষে শোধ করতে যাবেন না। আপনি শোধ করবার কে? যিনি ধার করিয়েছেন তিনিই শোধ করবার মালিক—এরকম একটা দার্শনিকমূলক মনোভাব নিয়ে পরম বিজ্ঞের মত বিচরণ করবেন। আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর ধার করার প্রথাটি অতীব সুন্দর। মুগ্ধ হতে হয়। বন্ধুবর স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত গম্ভীর। কোন রকম তারল্য তিনি বাড়ীর চৌকাঠে প্রবেশ করতে দিতে রাজী নন। শুধু তাই নয়—একটু খেয়ালী। খেয়ালের বশবর্তী হয়ে যখন মুক্তকচ্ছ হয়ে ব্যয় করে ঋণ করতে বের হ'ন তখন আরও মারাত্মক রকমের গম্ভীর হয়ে পড়েন। ফল পান হাতে হাতে। অল্প বয়সে অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হওয়ার ফলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপড়শী, সহকর্মী সকলের কাছ হতে কেমন একটা ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয়, স্নেহ-মিশ্রিত ভালবাসা ইত্যাদি পান। তিনি সেটি পুরোপুরি বুঝে বেশ ধারধোর করে চলেন। কোন গোলমাল নেই। 'ক'-এর কাছে ধার করে 'খ'-কে দেন, 'গ'-র কাছে ধার করে

'ক'-এর ধার মেটান। এমনিভাবে একটা ধারচক্র কেন্দ্রের ধারক হয়ে রয়েছেন।

আবার এক ভদ্রলোককে জানি যিনি বিশেষ বিশেষ জায়গায় ধার করবার সময় সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে বের হন। পুজোর সময় কাপড় কিনতে বের হয়েছেন। আমার সঙ্গে দেখা। এলাম পায়ে পায়ে। দোকানে ঢুকে তিনি এমন এক সাত্ত্বিক ভাব নিলেন যে অবাক হয়ে গেলাম। ভাবটা এইরকম যেন তিনি আমার সঙ্গে গল্প করতেই বের হয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী দোকানে ঢুকে প্রয়োজনীয় ছিট, ব্লাউজ, ধুতি, গামছা ইত্যাদি বেছে এক পর্বত করে তুলেছেন। কর্মচারীরা ঘর্মাক্ত কলেবরে পরিক্লান্ত। মালিক গদীতে বসে মালের হিসেব কষে মনে মনে মুনাফার কথা ভেবে আস্তে আস্তে হাই তুলছেন। এমনি সময়ে একেবারে নাপাম বোমা। ভদ্রমহিলা মুখ বিষণ্ণ করে বললেন—দেখুন জিনিষ কটা একটু আলাদা করে রেখে দেবেন। পরে এসে নে' যাব। ঠিক সেই সময়ে ভদ্রলোক গল্প থামিয়ে দোকানের দিকে মুখ বাড়িয়ে স্ত্রীর নাম ধরে বেশ বিরক্তিভরে জিজ্ঞেস করলেন—কী তোমার হলো? স্ত্রী তখন চূড়ান্ত ন্যাকামী আরম্ভ করেছেন। হ্যাঁ, পছন্দ করে রেখে যাচ্ছি, পরে এসে নে' যাব। এখন তো পয়সা আনিনি। ভদ্রলোক হঠাৎ হেসে যেন গড়িয়ে গেলেন। মালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখুন কাণ্ড। বলেই আবার হাসি। আড়চোখে ভদ্রলোকের স্ত্রীটিকে তাকিয়ে দেখলাম—লাজুকলতা। পূর্বে বলা হয়নি। ভদ্রলোক বেশ শিক্ষিত ও একটু সম্ভ্রান্ত পদমর্যাদার লোক। গুজরাটী বস্ত্রব্যবসায়ীর সাধ্য কী তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কলা-কৌশলের খেলায় পেরে ওঠেন। তবু একবার বললেন—ঠিক আছে মেমসাব্। কাল এসে লিয়ে যাবেন। আপনের মাল বিলকুল ঠিক থাকবে। মাছ জালে পড়ে জাল ছিঁড়ে বের হবার উপক্রম দেখে এইবার ভদ্রমহিলা পাশুপাত অস্ত্র ত্যাগ করলেন—শেঠজীর সাহস হচ্ছে

না নাকি? ব্যস। শেঠজীর তিনতলা ভুঁড়ি বার কয়েক নেচে উঠল হাসির তোড়ে—কী বলছেন আপনে, হামি কী তাই বলছে। দেখলাম ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের স্ত্রী, ব্যবসায়ী দোকানদার, তথা কর্মচারীরা সকলেই হাসছেন একই সঙ্গে। এরকম বিশুদ্ধ হাসি অনেক কাল শুনিনি দেখিনি। কাজ বাগিয়ে হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন রিক্সায়। আমি থ। এসব হচ্ছে অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচারের মতন। তবে রিস্ক নিতে হয়। তা কোন জিনিষেই বা রিস্ক না নিলে চলে বলুন। গোটা জীবনটাই তো একটা…। থাকগে ও সব অপার্থিব কথায় কান দিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে একটি লোটা ও কম্বল সম্বল করে ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা সেজে বেশ কিছু হাওলাত নিয়ে দেউলিয়া আখ্যায়িত হয়ে পরে টুন্‌টুন্‌ওয়ালা হয়ে জাঁকিয়ে সোনাপটীর গদীতে বস। কী আরাম—এর কী তুলনা আছে। মনে যদি খুব অনুশোচনা জাগে, প্রত্যহ না হয় পোয়াটাক চিনি পিঁপড়ের গর্তের কাছাকাছি ছড়িয়ে দেবেন। ধার করা খারাপ খারাপ যে করা হয়, কত বড় আহাম্মক হলে এ কথা বলা চলে তা ভাবলে দুঃখ পাই। কোথায় ধার নেই? সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ধার। মাতা ধরিত্রীর কাছে আমরা অপরিমেয় ঋণী। শুধু তাই নয়, যে চন্দ্রের কিরণে রাত্রি জ্যোৎস্না-স্নাত সেও ধার করা আলোয়। ধার করা জিনিষের জৌলুষই আলাদা। নানান দেশের দিকে তাকান। কি দেখছেন—শুধুই ধার। আমেরিকা ধার দিচ্ছে, রাশিয়া ধার দিচ্ছে—পাকিস্তান ধার নিচ্ছে, ভারত ধার নিচ্ছে।

কাগজ খুললে এমনিতর ধার দেয়া-নেয়ার কথা প্রত্যহ দেখা যায়। কিন্তু কেউ ধার শোধ দিচ্ছে বলে কি কোন খবর চোখে পড়েছে আপনার। তবে ধার নিতে দোষ কি? জিনিষ কিনলে যেমন ফাউ, বাঁচতে গেলে তেমনি ধার। ধার করেই চলেছে সব। সাহিত্যের বাজারে দৃষ্টিপাত করুন। সেখানেও ধার, ধার করে এবং সকৃতজ্ঞ

স্বীকৃতির বদলে নিজের বলে চালিয়ে দিতে পারলে লেখায় ওরিজিনালিটি খোলে—স্বদেশে সাহিত্য-ভূষণ অবশেষে বিদেশ গমন।

ধার করার প্রথা না থাকলে কলেজ-মেসের, হষ্টেলের বাসিন্দাদের কী দশা হতো ভেবে দেখেছেন কোনদিন? বাড়ী থেকে টাকা আসে নি। যে টাকা ছিল নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সিনেমা থিয়েটার দেখে 'আর রেস্তোরা ক্যানটিনে ফুঁকে যাঁরা ভোলানাথ সেজে বসে থাকেন তাঁরা যদি রুমমেটদের কাছে ধার না পান তো বিপদের সীমার যে অন্ত থাকে না। এত সব গূঢ় কথা চিন্তা না করে শুধু বাজে কথায় মিতব্যয়ী হতে বলে ধার দেওয়া থেকে এড়িয়ে গেলে আপনাকে ছাড়াই চলবে না। হয় ধার দিন নয় এই প্রাণঘাতী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করুন।

যিনি ধার দেন তিনি মহৎ, তিনি উত্তম তিনি উত্তমর্ণ—কম সম্মানীয় আখ্যা। মহাকবি কালিদাস সামান্য একটু ভুল করেছেন। তাঁর সেই স্মরণীয় উক্তি—যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা। এখানে আমি একটু নতুন আলোকপাত করি। কামনা পুরোলেও অধমে নয়। এই কামনা অর্থ ধার পাওয়ার কামনা। তবে বক্তব্য হচ্ছে কামনা পূরণ হলেই হচ্ছে—সে মানীর কাছেই হোক আর অধমের কাছেই হোক। এ শতাব্দীতে অত বাছবিচার চলে না।

সারাজীবন কোন ঝক্কি না ঘাড়ে নিয়ে ঘাড়ে চেপে তোফা কাটিয়ে দেয় পরগাছারা—শোধ দেবার প্রশ্ন পর্যন্ত নেই। অতএব ঊর্ধ্বে নিম্নে সর্বত্র যে সুনিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত তাকে লঙ্ঘন করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কী। স্ব-ইচ্ছায় ধার দিয়ে আর ফেরৎ যদি না নেওয়া হয় তবে তাকে বলা হয় দান করা। এই হিসেবে যিনি ধার দিয়ে ত্রিজগৎ পূজ্য তিনি হচ্ছেন দধীচি। তিনি দানবীর এবং ধারবীর। আত্মরক্ষার মতো ধর্ম আর নেই। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধার

করতে বাধ্য হওয়া পরম ধার্মিকের লক্ষণ। স্মরণে আসে না কোন এক পুস্তকে পড়েছিলাম—

নরানাং ধারং পুণ্য লক্ষণম্।
ধারেণ লক্ষ্মীং ভবতি, ধারেণ ক্রিয়তে হস্তী।
ধারেণৈব ভবেদ্রাজা, ধারং মূর্দ্ধনি বর্ত্ততে॥
ধারহীনং মনুষ্যাণাং নাস্তি কুত্রং সমাদরং।
কলৌ তু ইংরাজ-রাজ্যে ধারং ধারং মহাফলং॥
চলতি সংসারচক্রং ধারেনৈব অনুক্ষণং।
গৃহিণী-গহনা জ্ঞানী ধারে গড়য়তি সদা॥
তিষ্ঠেল্লোকেবিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু ধারং বিনা দেহে তিষ্ঠেৎ তু মম জীবনম্॥

ঘূর্ণায়মান চক্রের স্পর্শ ধার করে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর ধারালো হয়; 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে' জগতের সংস্পর্শে আমরাও আসুন ধারালো হয়ে ধরাধামে ক্রমশ ধড়িবাজ হয়ে ওঠি।

রচনাকাল: ১৯৫৬

উলট পুরাণ

"প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজধর্ম অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা বা কথাকে পুরাণ বলে।"

রমানাথ সরস্বতী বলেন—বেদের সংহিতায় এবং ব্রাহ্মণভাগে অনেক রাজা ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গের নাম ও আখ্যায়িকা দেখতে পাওয়া যায়। তাকেও পুরাণ বলে। এ ছাড়া বৈদিক সময়ে স্বতন্ত্র পুরাণ ছিল না। তবে সাধারণত ব্যাসাদি মুনি রচিত শাস্ত্র ও সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণে বিশেষিত হলে 'পুরাণ' অর্থে বিবেচিত হত। মূল পুরাণ অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, অগ্নিপুরাণ. ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ-পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কুর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, নারদপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ। এছাড়াও অপ্রধান বহুসংখ্যক উপপুরাণ আছে। সেই একখানি উপপুরাণ হচ্ছে আমাদের আলোচ্য 'উলটপুরাণ'।

নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই পুরাণে সোজা জিনিষকে উলটিয়ে দেখানো হয়েছে ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সে ব্যাখ্যা উদ্ভট কিছু নয়, তবে যুগজীর্ণ ম্লান বক্তব্যের মধ্যে যে একটা একঘেঁয়েমি এসে গিয়েছিল উলটপুরাণের রচয়িতা সেগুলি সামান্য উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে তার মধ্যে চমৎকার এক আস্বাদ অনুভবের সুযোগ করে দিয়েছেন। সেইজন্য তিনি আধুনিক চিন্তা জগতের পুরোহিত হিসেবে নমস্য। যত ভালই হোক পুরোনো হলে তার মাধুর্য কমে যাবেই। মাধুর্য কমে গেলে রইলটা কি? তাই এই উলটপুরাণের আবির্ভাব। উলটপুরাণের মধ্যেই নিহিত ছিল আবিষ্কারকদের মূল

সূত্রগুলি। ভবিষ্যৎকালের গর্ভে অপেক্ষমান কতশত বস্তুই এখনো এই উলটপুরাণের জীর্ণ পাতার মধ্যে বন্দিনী রাজকন্যার মতো রয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য আমাদের, এমন যে মহামূল্যবান একখানি পুরাণ এর সংবাদ আমরা বিশেষ কিছুই রাখিনা।

উলটপুরাণের রচয়িতা কে এ নিয়ে দেশ দেশান্তরে গবেষনার অন্ত নেই। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পাতে ঝোল টেনে বলেন: আমাদের দেশেই রচিত হয়েছিল এই মহামূল্যবান পুরাণখানি। কিন্তু এই পুরাণখানির রচনা বিষয়ে মোটেই তর্ক বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে রাজী নই। কে রচনা করেছিলেন, কোন শতাব্দীতে, কোন পটভূমিকায়—ভেবে, জেনে লাভ কি? তবে এই পুরাণ যে বিশ্বের গ্রন্থরাজির মধ্যে অনন্যসাধারণ একথা সকলের সঙ্গে আমরাও স্বীকার কার।

'হ্যামলেট' রচনা করেছিলেন কে, কে রচনা করেছিলেন 'মেঘদূত'—এ সব কোন প্রশ্নই নয়। তার জন্য কবর খোঁড়াখুড়ি করে হয়রান হয়ে লাভ কি। কী লাভ মেঘদূতের রচয়িতা প্রথম জীবনে উটকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে গিয়ে কী পরিমাণ নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন জেনে। যদি এমন হতো যে তিনি যেই হোন খুব শুদ্ধভাবে 'উষ্ট্র' বললেন, তাতে কি ক্ষতি বুদ্ধির পরিমাপনের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রচিত হত? মোটেই না। তবে কেন আমরা রচয়িতা বা তাঁর জন্মভূমি নিয়ে বিব্রত চিন্তায় মগ্ন হয়ে অনর্থক কালহরণ করবো। আমরা বরং 'হ্যামলেট' 'মেঘদূতের' মতো উলট পুরাণকে একখানি কালজয়ী গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করে বিশ্বের সম্পদ বলে মেনে নিয়ে, এর অন্তর্নিহিত ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গবেষণায় নিমগ্ন হব। আর সেটাই হবে সেই অজানা দিনের নামগোত্রহীন বিপ্লবী চিন্তানায়কের প্রতি যথার্থ সম্মান জ্ঞাপনের প্রকৃত প্রচেষ্টা।

প্রতিবেশিনীর কাছে

উলট পুরাণের মূল পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কোথায় আছে তার সঠিক হদিশ পাওয়া দুষ্কর। কেউ বলেন ন্যুইয়র্কের য়্যুনিভারসিটি লাইব্রেরীতে, কেউ বলেন লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে কেউ বলেন ফ্রান্সের বিবলিওথেক ন্যাশিওন্যালে অথবা কিয়েভের ন্যাশান্যাল লাইব্রেরীতে এর পাণ্ডুলিপিটি আছে। যেখানেই থাকুক উলট পুরাণের সারমর্ম গ্রহণে এখন সোভিয়েট রাশার জুড়ি নেই। তার পরের স্থান অবশ্য আমেরিকার। পৃথিবীখ্যাত সাহিত্যসেবী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, দার্শনিক, চিত্রকরদের ব্যক্তিগত রোজনামচার মধ্যে উলট পুরাণ পাঠের উল্লেখ আছে। জীবিকা উপার্জনে তাঁরা অনেকে প্রথম-বৃত্তিতে হতাশ হয়ে এবং উলট পুরাণের দাক্ষিণ্যে দ্বিতীয় বৃত্তিতে যশস্বী হয়ে গেছেন। ডাক্তার সমরসেট মম্ ঔপন্যাসিক হয়েছিলেন, স্কুল মাষ্টার এমার্সন দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক হয়েছিলেন, ব্যবসায়ী নিউটন বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ডারউইন নৃতত্ত্ববিদ, পেটেণ্ট পরীক্ষক আইনষ্টাইন গণিতজ্ঞ, মিস্ত্রী জেমস ওয়াট এঞ্জিন আবিষ্কারক, সাইকেল মেরামতকারী রাইট ভ্রাতৃদ্বয় বিমানপোত আবিষ্কারক হয়েছিলেন এই উলট পুরাণ পাঠের দৌলতে। উলট পুরাণ পাঠ করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, অন্তর্দৃষ্টি জোরালো হয়।

উলট পুরাণের মূল পাণ্ডুলিপি যে বর্তমানে রাশার কোন গোপন স্থানে আছে এবিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করে লাভ নেই, কারণ হালে যে সব গগনবিদারী আবিষ্কার সেখানে হচ্ছে তার কার্যকারণ সূত্রের হদিশ একমাত্র উলট পুরাণে পাওয়াই সম্ভব। তবে এখন রাশার সঙ্গে আমেরিকার গলায় গলায় বন্ধুত্ব। তার ফলে উলট পুরাণের সূত্র সমূহ অবলম্বন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে ও আবিষ্কারের জগতে মুহুর্মুহু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। টমাটো আর পটাটো গাছে টমাটো আর পটাটো হবে এতো সাধারণ ব্যাপার। উলট পুরাণের মূল সূত্র ধরে এখন টমাটো পটাটো মিশিয়ে পমাটো। মূলো

(র‍্যাফানোজ), কপি (ব্রাসিকা) মিশে হলো (র‍্যাফানোব্রাসিকা)। ভার্ণালাইজেসন, ফটোপিরিয়ডিজম এর দৌলতে নতুন বিপ্লব। রস মিষ্টি না হলেও আখ হচ্ছে বাঁশের মতো। রাতে আলোর পাহারা বসিয়ে ছ' মাসের ফসল যদি দু'মাসে ফলানো যায় তবে বাঁশাখের (বাঁশ + আখ) রসে মিষ্টি আসতে কতক্ষণ।

চাঁদ এখন আর সোভিয়েট খোকনদের কপালে টিপ দিতে নেমে আসে না—সে প্রথা লোপাট হয়ে গেছে। খোকাদের বাবা মশাইরা এখন চাঁদের কপালে গোলা ছুঁড়ে টিপ দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন না, তাদের মা-মণিরা সরাসরি টিপ পরিয়ে দিয়ে আসবার জন্য ক্যাপস্যুলে কোমর বেঁধে মহাশূন্যে ঘুরপাক খান।

যে মহাগ্রন্থের প্রতাপে দুনিয়ায় এত উলট পালট তার নির্গলিতার্থ বোঝা কিন্তু খুব কষ্টকর নয়। সোজা কথায় যা পুরোনো কাল থেকে জনশ্রুতি নিভর করে চলে আসছে তাকে উলটে দিতে হবে। উলটে দেওয়ার সময় কিছু ভাবলে চলবে না। উলটানোর পর ক্রমশ ভাবতে হবে। প্রথম প্রথম মনে হবে একটা অপরাধ করে ফেলেছি—অর্থহীন প্রমাদ। কিন্তু চিন্তার গভীরে ডুব দিয়ে দেখবেন ক্রমশ একটু একটু করে আপনার তৃতীয় নয়ন খুলে যাচ্ছে। আপনি নতুন আলোতে অর্থহীন বলে যা কিছু ভেবেছিলেন তার নির্মোক সরিয়ে দেখছেন, দেখতে দেখতে বুঝছেন, অপূর্ব জ্যোতির্ময় একটা ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিতে নির্ভর করে নেমে আসবে নতুন চিন্তাধারা, জগৎপ্লাবী একটা বিপ্লবাত্মক ধারণা, যে ধারণা পূর্বসূরীদের সমস্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দেবে।

আমার বক্তব্য যদি আপনার বোধগম্য না হয় তাহলে আরও পরিষ্কার করে উদাহরণ সংযোগে বললেই হৃদয়ঙ্গম করতে আপনার অসুবিধা হবে না।

এতদিন ধারণা ছিল সূর্যের গ্যাসীয় অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরপাক খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে একটা খণ্ড ধূলিময় এই পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে।

উলট পুরাণকে অবলম্বন করে সোভিয়েট বিজ্ঞানী অটো স্মিদৎ বললেন—না, তা নয়। মধুময় এই ধূলিকণাগুলি মহাশূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ধূলির চাক বেঁধে পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে। চমৎকার কথা এবং উলটো কথা। এখন ভাষ্যকাররা ভাষ্য করুন। নতুন এই মতবাদ অধুনা পুরোনো মতবাদকে উদ্বাস্তু করে ছেড়েছে। শুধু এই বিশ্বরচনার ক্ষেত্রেই এই পুরাণের সূত্র নতুন চিন্তার দিগন্তকে উন্মোচিত করছে না, তার প্রয়োগ ক্ষেত্র সুদূর প্রসারী।

পৃথিবী বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ডশ'র কথা ভাবুন। সমগ্র পৃথিবীতে সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি যে আলোড়ন আনলেন তাঁর লেখার মূলেও উলট পুরাণের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সোজা কথাকে উলটে বলায় তাঁর জুড়ি ছিল না। আমাদের দেশের মাইকেলের কথাটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রামায়ণের সুপরিচিত চরিত্রগুলির প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে উলটিয়ে দিয়েই না তিনি 'দমনিয়া ভবদম তুরন্ত শমনে অমর' হলেন। য়ুরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর জাঁ.জ্যাকস্ রুশো এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। মানুষের বুদ্ধির বিকাশমূলক যে কোন কাজে—রাজনীতিতে, ধর্মচেতনায়, সাহিত্যে, শিক্ষায় তিনি নতুন যুগচেতনা নিয়ে এলেন। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক রাজতন্ত্রকে উলটিয়ে দিয়ে শুধু যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনা করলেন তাই নয়, ভ্রান্ত ধারনার উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার আমূল সংস্কার সাধনেও ব্রতী হলেন। এই যুগন্ধর মহাপুরুষের আবির্ভাব না ঘটলে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ উদ্দেশ্যমূলক প্রাণহীন অপপ্রয়াস শিক্ষার মহান বেদীতে মর্মর মূর্তির মতো বিরাজ করতো। রুশোর পূর্বে শিক্ষার জন্য ছিল শিশু। রুশো উলটে বললেন—শিশুর জন্যই শিক্ষা। অমনি এক মহা বিপ্লবের সূত্রপাত হলো। রুশোর চিন্তাধারা সব কিছুকে উলটে তছনছ করে দিল। সেকালের লোকেরা এটাকে বিধ্বংসীমূলক, অবান্তর

কল্পনাপ্রধান বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু যিনি উলট পুরাণের বক্তব্যকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন তার মতামত উড়িয়ে দেওয়া কি এতই সহজ? (রুশোর রোজ-নামচাতেও উলট পুরাণ পাঠের উল্লেখ আছে)। শিক্ষা জগতে আজ তিনি কোপারনিকাস হিসেবে বিবেচিত।

কোপারনিকাসের কথা যখন এসে পড়ল তখন তাঁর কথাটাও সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। নিকোলাওস কোপারনিকাস পোলিস শহর টরুনের লোক। রুটিওয়ালার সন্তান নিকোলাওস ছিলেন যাজক। ধর্মতত্ত্ব ছাড়া তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও টেকনলজি অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। বহুবছর ধরে রাতের পর রাত গরমে, হিমশীতল আবহাওয়ায় কোপারনিকাস যেতেন ফ্রম বোর্ক ক্যাথিড্রালের গম্বুজের ছাদে। সুদীর্ঘ বছরের পরিশ্রমে তিনি টলেমীর ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে (অবশ্য চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া) শুধু নয়, দি হোলি বাইবেলের মতকেও সম্পূর্ণ উলটিয়ে দিলেন। বাইবেলের মতে, বিশ্বজগতের কেন্দ্র হল পৃথিবী—কোপারনিকাস উলটে বললেন—পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র নয়, অন্যান্য গ্রহদের মতো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা ছোট্ট একটা গ্রহ মাত্র। উলটো কথাই সত্যি হলো, উলট পুরাণের দৌলতে।

আমার বন্ধু পরমেশ উলট পুরাণ না পড়ে উপনিষৎ গ্রন্থাবলী পড়তে গিয়ে মহাবিপদে পড়েছিল। কিছুতেই ধরতে পারে না। বলে - এর মানে কি?

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

বললাম—এর মানে হচ্ছে, ইনি চলেন, আবার চলেন না, ইনি দূরে আবার অদূরে, ইনি সমস্ত জগতের মধ্যে, আবার সমস্ত জগতের বাইরে অবস্থিত।

প্রতিবেশিনীর কাছে

পরমেশ রেগে থাপ্পা! বলল—ইয়ার্কি পেয়েছ। যত সব উলট পালট কথা।

ওকে ঠাণ্ডা করলাম। পরে উলট পুরাণের মর্মার্থ বুঝিয়ে দিয়ে পড়তে বলায় ও সুন্দর ভাবে বুঝতে পারল। শুধু বোঝা নয় পরমেশ এখন বন্ধুমহলে উপনিষৎসমূহের একজন ভাল ব্যাখ্যাকার হিসেবে গণ্য।

সেদিন আমার এক আত্মীয় তাঁর ছেলের লেখাপড়া বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন—ছেলেটা এমনি পড়াশোনায় ভাল কিন্তু অঙ্ক দেখলে ভয় পেয়ে পালায়।

আমি শুধরে দিয়ে বললাম—তা নয়, পালায় বলেই ভয় পায়। আত্মীয়টি কিছুতেই মানতে রাজী নন্।

বললাম—এটা আমার কথা নয়। পুরাতনকালের মনস্তাত্ত্বিক ধারণা উলটে গেছে। কথায় কথায় উলট পুরাণের কথা উঠল। তখন আমার আত্মীয়টি ব্যাপারটি বুঝে ক্ষান্ত হলেন।

উন্নতি, আবিষ্কার, নতুনত্বের ধারক বাহক এই উলটপুরাণ। ভারতবর্ষের এক স্ফীতোদর সম্প্রদায় ব্যবসার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে তার মূলেও এই উলটপুরাণ। খোঁজ নিয়ে দেখবেন তাঁরা প্রতি রাত্রে উলটপুরাণের শ্লোক মুখস্থ করেন। প্রয়োগ ক্ষেত্রে এক ব্যবসা থেকে অন্য ব্যবসা ফাঁদবার প্রাক্কালে পাওনাদারদের ফাঁকি দেবার জন্য হামেশাই গণেশ-উলটিয়ে (উলট পুরাণ শাস্ত্রে দক্ষ বলেই) প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করেন।

সম্প্রতি বাংলা দেশের আধুনিক কবিরা উলট পুরাণের সন্ধান পেয়ে গেছেন। এবং তারই ফলে অন্বয়-বোধ-বুদ্ধি-চেতনা সমন্বিত কবিতার প্রতিমাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে সব উলট পালট করে দিতে ব্যস্ত রয়েছেন। কবিতা রচনা করবার জন্য এখন আর সমাহিত হবার প্রয়োজন নেই, ন্যূনতম ধৈর্যের দরকার নেই, নেই কোন উপলব্ধিগত

মাহেন্দ্র মুহূর্তের আবির্ভাব লগ্নের জন্য প্রতীক্ষা—এখন কবিতা পক্ষে পক্ষে, সপ্তাহে সপ্তাহে, দিনে দিনে, মুহূর্তে মুহূর্তে রচনা করা যায়। এক অনায়াসলব্ধ তপস্যাহীন ইপ্সিত আমলকীর মতো ঝরণা কলমের নিব ভেদ করে মন্দাকিনীর ধারায় দুর্বার গতিতে নেমে এসে খণ্ডিত বঙ্গদেশে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করেছে। সে কার দৌলতে? কবিতা সম্বন্ধে প্রাক্তন জরাতুর ধারণাকে উলট পুরাণের সূত্র উৎখাত করেছে বলেই তো।

কবিতা পাঠ করে পাঠকের বোধ ও বোধির জগতে যে রসের প্রবাহ বইত আজ তা উলটে গেছে। বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে কবিতা বুঝে ফেললে সে কবিতা 'পদ্য' বলে পরিগণিত হবে। উলট পুরাণ কবিতার এই উজ্জ্বলতম ধারণা বিকাশে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে চলেছে। অতএব মাভৈঃ। কবিতা রচনার বিষয়ে আপামর জনসাধারণকে যে স্বাধীনতা উলট পুরাণ এনে দিয়েছে তার জন্য আমরা সকলেই কৃতার্থ।

উলট পুরাণ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি না পড়া যায়, যদি না তার ভিতরের অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহলে কিন্তু বিপদের অন্ত থাকবে না। ভারত ইতিহাসের এক করুণ নায়কের কথা মনে পড়ছে। একমাত্র দুঃখজনক সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়া সেখানে করার কিছুই নেই। উলট পুরাণের সূত্রগুলি গরহজম হয়ে মহম্মদ বিন তুঘলকের কি অবস্থা হয়েছিল সে কথা আপনারা সবাই জানেন। সারা জীবনটা উলট পালট ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই কেটে গেল এই অনন্ত সম্ভাবনাময় পুরুষের।

এই নিবন্ধ পাঠে আপনারা অনেকেই উৎসাহিত হয়ে উলট পুরাণের সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে ক্লান্ত হবেন। হয়ত ব্যক্তিজীবনে, সংসার-সমাজ জীবনে একটা অনর্থ বাঁধিয়ে বসবেন। তাই আমি কিছু প্রতিষ্ঠিত সুপ্রচলিত প্রবচনকে উলট পুরাণের সূত্র মনে রেখে উলটে লিখছি। পড়ে, ভেবে দেখবেন।

প্রতিবেশিনীর কাছে

'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'—এই প্রচলিত প্রবাদবাক্য উল্টিয়ে দিয়ে দেখুন অর্থাৎ 'উপায় থাকলে ইচ্ছা হয়'।

কেমন লাগলো ?

আচ্ছা সত্যি বলুন তো ইচ্ছা থাকলেই কী উপায় হয় ? আপনার কি ইচ্ছা হচ্ছে না পুজোর ছুটিতে আগ্রায় গিয়ে তাজমহলের শ্বেত পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে শরতের আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে একটু কাব্য করতে, অথবা দই-ইলিশ দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে শারদীয় রোদের দুপুরে আপনার প্রিয় ক্যামেরাটিকে নিয়ে রঙীন ফিল্মে ছবি তুলতে ? এ সব ইচ্ছা কার না হয়। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকলেও কোন উপায় নেই, হতে পারে না। উলটানো প্রবচন 'উপায় থাকলে ইচ্ছা হয়' নিয়ে এইবার ভেবে দেখুন। কী স্বাভাবিক সরলতায় এই শব্দসমষ্টি সামগ্রিক এক বোধের বিকাশে কার্যকরী হচ্ছে। আপনার ইচ্ছা পূরণে 'উপায়' হচ্ছে প্রধান অস্ত্র, যার সহায়তায় হাজারো ইচ্ছা ফলবতী হবে। উপায়ের হাত ধরে ইচ্ছারা মিছিল করে আসবে স্বাভাবিক সরণি ধরে।

তাই বলছিলাম—উপায থাকলে ইচ্ছা হয়। এমনি কয়েকটি প্রবচন উলটে দিলাম।

মহতের দ্বারা চালাকির কাজ হয় না। মুলুক যার জোর তার। অসৎ সঙ্গে কাশীবাস, সৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

সত্যি কথাটা উলটানোর মধ্যেই আছে কিনা আপনিই বিচার করুন।

রচনাকাল : ১৯৬৭

দেউল পরিচিতি : কোনারক

সূর্যমন্দির কোনারক উড়িষ্যার সুপ্রাচীন মন্দির-ভাস্কর্যের সর্বোত্তম সম্পদ। বহিরাঙ্গ প্রসাধনে এমনতর দৃষ্টিনন্দন মাধুর্য পৃথিবীর খুব কম সৌধেই কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনারকের সূর্য মন্দির নির্মিত হয়। শ্রীধাম পুরী থেকে একুশ মাইল উত্তরপূর্ব দিকে এই বিশাল দেবায়তন দণ্ডায়মান। চোড়গংগা বংশীয় নৃপতি নরসিংহ দেব (১২৩৮—১২৬৪) মহাব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে কৃতজ্ঞতাবশত এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় বারো শ' শ্রমিক ও ভাস্কর ষোল বৎসর পরিশ্রম করে বিশ্বের বিস্ময় এই মন্দির নির্মাণ করেন। ধারনা করা হয় যে সুদীর্ঘ বারো বৎসরের অর্জিত যাবতীয় রাজস্ব সম্পদ এই মন্দির নির্মাণে ব্যয়িত হয়। শতশত মাইল দূর থেকে মন্দির নির্মাণ-কল্পে প্রস্তর বহন করা হয়। কিভাবে যে তৎকালে এই বৃহদাকার প্রস্তর সমূহ বাহিত হয়েছিল তা এখনও বিস্ময়াবৃত।

সুবৃহৎ দেব-দেউলটিকে বৃহদাকার রথাকৃতিতে গঠন করা হয়। অনুপম সাতটি বলবন্ত হয়রাজ বাহিত এবং চব্বিশটি চাক্রের উপর স্থাপিত এই মন্দিরটির অবস্থিতি এরূপ যে বালারুণের প্রথম রশ্মি তির্যকভাবে মন্দিরস্থিত সূর্য মূর্তির মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করত। চব্বিশটি অশ্ব দিনের চব্বিশ ঘণ্টা এবং সাতটি অশ্ব সপ্তাহের সাতটি দিন অথবা বর্ণালীর সাতটি রঙের প্রতীকে পরিকল্পিত। প্রধান অংশ ভূমিস্মাৎ হয়েছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু জগমোহন। তার দশ গজ পরিমিত দূরে প্রধান নাটমণ্ডপ। এককালে ঐ স্থানেই প্রায় বারোফুট উচ্চ স্তম্ভের উপর সূর্যসারথি অরুণ অবস্থান করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনৈক মারাঠা সাধু এই স্তম্ভটিকে পুরী নিয়ে

আসেন। জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখে এখন সেটি অবস্থিত। প্রধান মন্দির যেটি ভূমিস্মাৎ হয়েছে তার উচ্চতা নাকি ২২৭´ ছিল বলে পণ্ডিতেরা ধারণা করেন। বর্তমানে যেটি দৃষ্ট হয় তার উচ্চতা প্রায় ১৩০´।

জগমোহন মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরকে ভোগমণ্ডপও বলা হয়। এই নাটমণ্ডপ নৃত্য, গীত, আমোদানুষ্ঠান প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হতো। সূক্ষ্মতম কারুকার্য সমন্বিত মনোরম নাট মন্দিরটির তিলার্ধ পরিমিত স্থান শিল্প কর্ম হতে অব্যাহতি পায়নি। দক্ষ ভাস্করদের ছেনি হাতুড়ির নিপুণ খোদাইকার্যে কোনারকের দেউল গাত্র যে কি মনোময় বিলাসী রূপ লাভ করেছে সে কথা বলে দাঁড়ি টানা যায় না।

মন্দিরের পাদমূলে অবিনশ্বর সবুজ ক্লোরাইটে ক্ষোদিত সৌকর্যের উদ্‌গতি, সপ্তাশ্ববাহিত সারথি অরুণ চালিত সূর্যমূর্তি, হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা প্রসূত নবগ্রহ মূর্তির সে কি অনায়াস উপস্থিতি! তিন দিকের তিন দেয়ালে সূর্যমূর্তিগুলির মধ্যে দিনান্তের দিকে তাকানো বিশাল সেই সূর্য মূর্তিখানি তুলনাহীন অক্ষয় সৌন্দর্যে রচিত।

সমগ্র মন্দির পর্যবেক্ষণ করার পর বিশপ হেবারের মতোই বুঝি বলতে মন যায়—The Indians built like Titans and finished like jewellers.

কোনারকের সূর্য মন্দির ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির অপেক্ষা নবীন হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তার এই ভগ্ন দশা সে কথা ঠিকমত বলা কষ্টকর। এই দেউলের প্রধান অংশের পতন সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন, কোন দিনই এখানে পূজা আরতি হত না। তৈরী হবার কিছুদিন পর এর ভিৎ বসে যায় ও মন্দিরটি পড়ে যায়। অনেকে বলেন—কালাপাহাড় সৈন্য নিয়ে এই মন্দির

আক্রমণ করেন। বোমা ছুঁড়ে দেব-বিগ্রহের অঙ্গহানি করেন। শুধু তাই নয় এর ভিতের ভারসাম্য নষ্ট করে দেওয়ায় মন্দিরটি ধ্বসে পড়ে যায়। অনেকে বলেন বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের ফলে মন্দিরটির বর্তমান ভগ্ন দশা ঘটে।

এই মন্দিরের পতন সম্পর্কে কিংবদন্তীটি হচ্ছে যে, সূর্যদেব জনৈক ঋষি-কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে গেলে সে যখন ভীত হয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নেয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই নাকি এই সূর্য মন্দির ভেঙ্গে পড়ে।

এই মন্দির কোনদিনই সুসম্পূর্ণ হয়নি যাঁদের মত, তাঁদের মতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় মন্দিরের চাবি পার্শ্বস্থ অলঙ্কৃত স্তূপীকৃত শিলা খণ্ডেরা নিজেই। সূর্য মন্দিরের ভিতরে প্রকোষ্ঠ ছিল। আজও বৃহদাকার কাড়গুলো দেখতে পাওয়া যায়। এই কড়ি নির্মান করতে কোন মেসিনের সাহায্য নেওয়া হত না। ছোট ছোট লোহার পেরেকগুলোকে একত্রিত করে চাপ দিয়ে তৈরী করা হত। এগুলোর মান বর্তমান কালের কড়ি অপেক্ষা কম নয়। এই মন্দিরের মধ্য ভাগে দেব মূর্তি প্রত্যহ পূজা পেতেন তার যথেষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান।

এই মন্দিরটির পতন সম্পর্কে যে মতটিকে গ্রহনযোগ্য বলা চলে সেটি হচ্ছে চন্দ্রভাগা নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার ফলে কোনারক বন্দরের বিখ্যাতি লুপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বালুকা-ভূমি ব্যাপ্তি লাভ করে। ১২৯৯ সালের দুর্দান্ত সামুদ্রিক ঝড়বাহিত বালুকারাশি এই মন্দিরের অনেকটাই গ্রাস করে। ফলে এর ভিৎ বসে যায় এবং অঙ্গহানি ঘটে। ধ্যানাতীত মহিমায় গুপ্ত-পাল বংশীয় স্থাপত্য শিল্পকর্মের রাজসাক্ষী এই সূর্য দেউল মহাকালের প্রহারে জর্জরিত জরাতুর অশক্ত অবস্থায় জনশূন্য বালুকাভূমিতে তার চূর্ণ-বিচূর্ণ অপ্সরী, কিন্নরী, দেব-দেবী মূর্তি, জীবজন্তু, লতাপাতা, মিথুন মূর্তি এবং সর্বোপরি মহতী শিল্প মণ্ডিত কারুকর্ম নিয়ে ম্লান

মুখে অসহায় হয়ে কালের গহ্বরে বিলীন হবার দিন গুনছে। তা সত্ত্বেও তার আকর্ষণ আজও কিছু কম নয়।

উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরে বিশেষ করে কোনারকের মন্দির গাত্রে যে সকল মিথুন মূর্তি আছে সে সম্বন্ধে ব্যক্তি মানস সরোবরে নানান প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয়। কি জন্য যে ঐ সকল মিথুন মূর্তি মন্দিরের অঙ্গ সজ্জায় ব্যবহৃত হতো সে সম্বন্ধে চূড়ান্ত কিছু বলা অসম্ভব। তবে প্রধানত মনে হয় দেব বিগ্রহের সুখাবস্থিতি ও মনোবিনোদনের জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুকুমার ছন্দময়ী শিল্প কর্মে মন্দির গাত্র খোদিত হত। সুতনু ও সুতন্বীদের মিলিত লীলার প্রসন্ন অভিব্যক্তিতে, অপ্সরী অপ্সরা, কিন্নরী, শক্তিমান সুঠাম দেবদের্বার লাস্যোৎফুল্লতায় এই মন্দির প্রথম দর্শনেই দর্শকের হৃদয় হরণ করে।

আদিম প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তাড়নে তপ্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ বীর্যবান নর-নারীদের প্রস্তরদেহী মিথুন মূর্তিগুলি সাধারণ সংজ্ঞায় অশ্লীলতার চূড়ান্ত সীমানায় নিলাজ ভঙ্গিতে শত শত বৎসর ধরে দণ্ডায়মান। ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে, খসে খসে ভাঙ্গছে, জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে শ্রীহীন হয়ে, তবু মিলনের আনন্দকে আঁকড়ে ধরে আছে নিবিড় দৃঢ়তায়। বিদ্যাপতির পদ মনে পড়ে—তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

দেব মন্দির প্রধানত আনন্দধাম, কেননা এখানে স্বয়ং আনন্দের বসতি। তাই তার চারপাশের পরিবেশে শুধু মাত্র আনন্দের ফোয়ারার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। আমাদের রক্তে দেবতাকে প্রিয় করে নেওয়ার প্রবৃত্তি খেলা করছে। তাই যেখানে দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয় সেখানে থাকে ভোগমণ্ডপ, নাটমণ্ডপ, রাসমণ্ডপ, উদ্যানবিতান। সব কিছুর ব্যবস্থা করা হয় দেবতার—দন্ত ধাবন, স্নান, বস্ত্র পরিধান, বালভোগ, পঞ্চান্ন ভোগ, মধ্যাহ্ন ভোগ, বিশ্রাম, শৃঙ্গার, শয়ন ইত্যাদির। দেবতাকে আলাদা করে দেখা হয় না।

তাই তাঁর মনোরঞ্জনের প্রথাতেও থাকে লৌকিক আবেদন। এই আলোকে যদি মন্দিরের অঙ্গসজ্জা লক্ষ্য করা যায় তাহলে অশ্লীল বলে কিছুই থাকে না। সত্য মাত্রেই সুন্দর। যা কিছু স্বাভাবিক নয় তাই বর্জনীয়।

বিশুদ্ধ ভারতীয় চেতনায় প্রকৃতি ও পুরুষ একেরই উভয় রূপ। তিনি অর্ধনারীশ্বর। গান শুনলাম সেদিন এক বাউলের কাছে। 'হলেন ভগবতী রূপে ভগবান হরের ঘরে হর ঘরণী'। মিলনেই সম্পূর্ণতা। এবং এই মিলন অপরিহার্য। বিভিন্ন মূর্তিতে নর এবং নারী মহিমাকে পূজা করা হয়। শুধু নর ও নারীই নয়, প্রজনন শক্তির প্রতীক রূপে লিঙ্গ ও যোনি পূজার রীতিও সুবিদিত। দেহের প্রতিটি অঙ্গই পবিত্র। সৃষ্টির মহিমা দেহের দেউলে অনুক্ষণ কীর্তিত হচ্ছে। সতীর দেহ বাহান্ন অংশে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাহান্ন স্থানে। বাহান্ন পীঠ হল। প্রতিটি পীঠই হল মহিমময়। কাজেই দেউল গাত্রে নগ্ন সৌন্দর্যের প্রদর্শনীতেই আপত্তি থাকতেই পারে না।

আমরা হুইটম্যান পড়ি। দেহের গোপনতম স্থানের জয়গানে মুখর হুইটম্যানের কাব্য বিশ্ববন্দিত। অকপট অসঙ্কোচ প্রকাশের মধ্যে পূর্ণ সুষমা বিরাজমান। স্বর্গোদ্যানে আদিম মানব ও মানবী আদম ও ঈভের যে সুখ-বিহারের কাল্পনিক চিত্র পৃথিবীর অসংখ্য জনগণের পরিচিত সেই চিত্রের খোদিত রূপ যেন কোনারকের দেউলগাত্রে স্থান পেয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় যে—মিথুন মূর্তিগুলির সবগুলিই নগ্ন। সম্পূর্ণ নগ্ন থাকার দরুণ মনে কোন কলুষ ভাব উপস্থিত হবার সুযোগ দেয়না। এই প্রসঙ্গে একটি সুখ্যাত ছোট গল্পের অবতারনা করলে অসঙ্গত হয় না। গল্পটি হচ্ছে এক রাজা জনৈক বিখ্যাত শিল্পীকে ডেকে একখানি উৎকৃষ্ট চিত্রপট অঙ্কন করবার আদেশ দিলেন। শিল্পী প্রচুর পরিশ্রম ব্যয়ে বহুদিন পর একখানি অপূর্ব সুষমামণ্ডিত নগ্ন

নারী দেহ অঙ্কন ক'রে যখন রাজ সমীপে এলেন তখন রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্লীলতার জন্য শিল্পীকে কোতল করবার হুকুম দিলেন। তখন অন্য এক শিল্পী রাজাকে হুকুমটি কিছুক্ষনের জন্য স্থগিত রাখতে বলে চিত্রপটের নারীমূর্তির নগ্ন পদযুগলকে এক জোড়া মোজা এঁকে ঢেকে দিলেন। কিন্তু তখন রাজা আর চিত্রপটটি অবলোকন করতে পর্যন্ত সমর্থ হলেন না। সামান্য একজোড়া মোজা অঙ্কন করে দেওয়ায় জঘন্য মনোবিকারের প্রতিফলনে চিত্রটি এক নারকীয় বীভৎসতা ধারণ করেছে। রাজা তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে উভয় শিল্পীকেই প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

বস্তুত নগ্ন সৌন্দর্যের শরীরে সামান্যতম আবরণ পীড়াদায়ক। মন্দির গাত্রে সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্তিগুলি দেব দেউলের পবিত্রতাকে চরম উৎকর্ষের দিকে নিয়ে গেছে বলে আমি মনে করি। বৃদ্ধ ইতিহাসবেত্তা অথবা ছিদ্রান্বেষী গবেষকদের কাছে এই মন্দিরের বিচিত্র শৃঙ্গার ভাস্কর্য মনোবেদনার কারণ হতে পারে। তবে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বা ব্যক্ত, উক্ত অথবা অনুক্ত আচ্ছাদিত অথবা অনাচ্ছাদিত যাই হোক না কেন সব কিছু ছাপিয়ে যদি সৌন্দর্যাচ্ছন্ন থাকে তা হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। অবশ্য যুগে যুগে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা পালটায়। প্রতিভাধর শিল্পীরা সৃষ্টি করেন অচঞ্চল তন্ময়তার সঙ্গে। তারপর যুগের পর যুগ কাটে। পণ্ডিতদের কালাপাহাড়ী আক্রমণ আরম্ভ হয়। শিল্পের মূল্য নিরূপন করতে গিয়ে শিল্প-কর্মটিকে বাদ দিয়ে অথবা একঘরে করে রেখে সামাজিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক চেতনা প্রভৃতিকে নিয়ে বাগবিস্তার করা হয়। উপলক্ষ লক্ষ্যের মাত্রাকে যায় ছাড়িয়ে।

যে দুটি কথা আমি হামেশাই শুনেছি অথবা আলোচিত হতে দেখেছি সে দু'টি হচ্ছে রাজা, বাদশারা ভোগ বিলাসী ছিলেন ও অত্যাচারী ছিলেন, তাঁদের অত্যাচার-লব্ধ অর্থের অযথা অপব্যয়ে এই সমস্ত কীর্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, ভোগ ঐশ্বর্যের

ঢেঁড়া পিটিয়ে। আর একটি হচ্ছে সমাজে দুর্নীতি ও যৌন ব্যভিচারের বন্যা বইত—যার প্রতিফলন হয়েছে এই সমস্ত শিল্প-ভাস্কর্যে। বলা বাহুল্য সমস্ত মহৎ শিল্পকেই এই সমস্ত ছেলেমানুষী মন্তব্যের দ্বারা জখম করে এক প্রকার অপূর্ব পুলক লাভ করা যায়। শিল্প-সৌন্দর্য দর্শন করতে গেলে একটি বিশুদ্ধ সংযমী মনের প্রয়োজন। সাধারণ ক্ষেত্রে শিল্পের বাহ্যিক প্রকাশটিকে সব কিছু ভাবা হয়, যার ফলে আসল বক্তব্য ধরা পড়ে না। মত্ত অসংযত মনের কাছে মহতী শিল্প ধরা দেয় না। চঞ্চল মনের রাশ বাগিয়ে ধরতে হয় তবেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শান্ত ভাব নিয়ে ডুব দিতে হয় গভীরে। 'যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাঁদের মন। সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হ'ল।'

যৎকালে এ মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল, যে সমস্ত রাজারা এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন বা যে সমস্ত শিল্পী ও ভাস্কর এই দেব দেউল নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা হয়তো যৌনবিকারগ্রস্থ হলেন—এ সন্দেহ অনেকের মনে জাগে। অথবা অনেকে ভাবতে পারেন যে মিথুন মূর্তিগুলিকে মন্দিরের অঙ্গ সজ্জায় ব্যবহার করায় সাধারণ দর্শকের মনোবৃত্তি বিকারের পথে যেতে পারে। এ আশঙ্কা অমূলক। মনোবিকারগ্রস্থ রাজা বা শিল্পী দু'দশজন থাকা হয়তো অস্বাভাবিক নয় তেমনি অপর পক্ষে একথাও বিশ্বাস করাও অস্বাভাবিক যে সমস্ত ভারতবর্ষ শত শত. বৎসর ধরে বিকারের জ্বরে ভুগছিল। বিশেষ করে পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দেবায়তন প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে গুপ্ত ও গুপ্ত-পাল শিল্পের যেটা সুবর্ণযুগ বলে

উত্তর ভারত ইতিহাসে চিহ্নিত। জৈন, বৌদ্ধ ধর্মমতের দ্রুত প্রচারের ফলে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভা ম্লান হয়ে এসেছিল কিন্তু গুপ্ত রাজ আমলে নিষ্ঠার প্রাবল্যে, তাঁদের বদন্যতায়, পুনরায় অসংখ্য মন্দির ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বুদ্ধদেব বিশেষ এক ধরণের নৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সে নৈতিক আদর্শ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিকে বরদাস্ত করা হত না। বিশেষ করে নারীসঙ্গ অনুচিত বলে বিবেচিত হত। সব ক্ষেত্রে বুদ্ধ-ভক্তরা স্বয়ং বুদ্ধদেবের আদেশ মানতে রাজী থাকতেন না। এমনকি তথাগতের জীবিতকালেই তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করা হয়। অবশ্য বুদ্ধদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে বহিষ্কার দণ্ডে দণ্ডিত করেন। যাই হোক বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম নিয়ে বিশেষ আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে উপরোক্ত বক্তব্যের কারণ হচ্ছে যে, মানবীয় ধর্মের সাবলীল স্ফুরণে যদি বিঘ্ন উপস্থিত হয় তবে তার বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘটা অসম্ভব নয়। যার ফলে তান্ত্রিক সাধনার স্বাভাবিক পথে অনেকে নেমে গিয়েছিলেন অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে। বিপরীত পদার্থের প্রতি আকর্ষণ সব-ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ঠিক এমনি এক বিশেষ কারণে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের আতিশয্য কমে গিয়ে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সুযোগ এলো তখন যে নারীসঙ্গ পরিত্যাগের বিষয় ছিলো সেই নারীসঙ্গকে প্রবল আতিশয্যে প্রতিষ্ঠা করা হল শিল্পে, সাহিত্যে সর্বত্র, সাড়ম্বরে—এমনকি মন্দির গাত্রের অলঙ্করণে।

কোনারক মন্দির দর্শন যাঁরা করেছেন তাঁরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করে থাকবেন যে মিথুন লীলার মহিমা মন্দির গাত্রে স্থান পেয়েছে বিশেষ করে নিম্ন ভাগে। উর্ধ্বদিক ক্রমশ অবলোকন করলে দেখা যায় যে মিথুন মূর্তি কমে আসতে আসতে মোটেই আর স্থান পায়নি। সেখানে স্থান পেয়েছে দেব-দেবী, কিন্নরী, বাদিকা, প্রভৃতির মূর্তি।

এবং সম্পূর্ণ উর্ধ্বভাগে কোন মূর্তি নেই। সেস্থানের নাম পদ্মক্ষেত্র, যার উপরে সকল সৃষ্টি পালন কর্তা সৌরজগতের চির নবীন অধীশ্বর সূর্যদেব অযুত-অসংখ্য ভাস্কর জ্যোতিঃ বর্ষণ করেন।

মন্দির পরিকল্পনার বিন্যাসে মনোবৃত্তির উর্ধ্বায়নের ক্রমবিকাশের ধারাটি যথেষ্ট ইঙ্গিতময়। রাজা পরীক্ষিতের জীবন অবসানের কালে পরম ভাগবত শুকদেবের রাসলীলার মাধ্যমে পার্থিব জীবনের সম্ভোগ-স্তর বর্ণনান্তে অপার্থিব আধ্যাত্মিক অমৃতময় লোকধামের চিত্ররূপ দর্শন করানোর কথা মনে পড়ে কোনারক মন্দির দেখতে দেখতে।

প্রাপ্ত শ্লোক থেকে জানা যায় যে দেবতাদের ক্রোধ এবং বজ্র-বিদ্যুতের হাত হতে রক্ষা করবার নিমিত্ত ঐ সমস্ত মিথুনমূর্তি রক্ষীদের কাজ করছে। সুন্দর-অসুন্দর সকল কিছুরই প্রকাশক হচ্ছেন সূর্যদেব। তাই বিশেষ করে সমুদয় সুন্দর-অসুন্দর নির্মমভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই অর্ক অর্থাৎ সূর্যক্ষেত্র কোনারকে। আবরণহীনতা সহনীয়, আবরণ ক্ষীণতা অসভ্যতা।

কোনারক মন্দিরের ভাস্কর্য সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত :—

Rothenstein বলেন 'To day we look at Konarak, Bhuvaneswar and Khajuraho and accept them greatfully with the dancing Greek nereids, the figures, from Boticillis.' "Primavera" or "Venus rising from the sea" as enchanting manifestations of man's delight in human beauty.

"Sir John Marshall বলেন—"There is no monument of Hindusthan, I think, that is at once so stupendous and so perfectly proportioned as the Black Pagoda (sun temple) and none which leaves so deep an impression in memory."

Hunter বলেন—"Sculptures in high relief, exquisitely cut but an indecent character, cover the exterior walls, and bear witness to an age when Hindoo artists worked from nature. The nymphs are beautifully shaped woman in luscious attitudes, the elephants move alone as the true elephant trot and kneel down in the stone exactly as they did in life."

Dr. Block মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য সম্পর্কে বলেন—"It should be borne in mind that the word obscene and the notion it conveys were unknown to the ancient Indians. On all the productions of Kalidas and of many other famous Sanskrit poets are numerous scenes and descriptions, the true meaning of which it would be difficult to explain to an audience of ladies, but there is not the slightest reason to suppose that any one in antiquity took exception either to these or to the realistic carvings of the Black Pagoda.

এই বৃহদাকার পাথুরে দেবদেউলে যে সমস্ত জিনিষ খোদিত আছে তাদের একটা ছোট খাট তালিকা দিলাম। আরও খুঁটিয়ে দেখলে হয়ত অনেক জিনিষ চোখে পড়ত। যেগুলি চোখে পড়েছে সেগুলির কথাই উল্লেখ করি। প্রমাণ সাইজের হস্তী, বৃহদাকার রণ সাজে সজ্জিত অশ্ব, সিংহ, পত্র-পুষ্প ভূষিত লতাগুল্ম, সুন্দর কারুকার্য খচিত দরজা, আঙ্গুর ভক্ষণরত জিরাফ, পালঙ্কোপরি সুসজ্জিত শয্যায় আসীনা রমণী, সাধনারত ঋষি, নৃত্যপরা নারী, উষ্ট্র, সর্প,

বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্র (মৃদঙ্গ, খঞ্জনী, তারযন্ত্র, ঢোলক ইত্যাদি) বাদনরত স্ত্রী ও পুরুষ মূর্তি, সঙ্গীসহ ভ্রমণরত সম্রাট, মুরলীধর মূর্তি, কুমীর, মৎস্য, পদ্ম, যক্ষিনী, নায়িকা, সাকী, অশ্বারূঢ় সূর্যদেব, অপরূপ স্তম্ভ, সুশোভিত চক্র, জ্যামিতিক নক্সা, আলপনা, বলিষ্ঠ কারুকার্য সমৃদ্ধ ভাস্কর্যে এই দেবায়তনের সমগ্র শরীর চিত্রিত।

মর্মস্পর্শী সুঠাম গাম্ভীর্যের অভিনব অভিব্যক্তি কোনারকের সূর্য মন্দির কেন যে বন্ধ্যা বালুকাময় নির্জন ভূভাগে তৈরী করা হয়েছিল সে কথা মনে প্রশ্ন তোলে। তবে এই স্থানের প্রাচীন মানচিত্র পর্যবেক্ষন করলে তার কারণ খুঁজে পেতে দেরী হয় না। কোনারক এক সময়ে উড়িষ্যার বিখ্যাত বন্দর ছিল। চন্দ্রভাগা নদীর মোহনার অনতিদূরে অবস্থিত কোনারকে ধনজন সমৃদ্ধ নিরুপম জনপদ ছিল। চন্দ্রভাগা নদী নাব্য থাকায় কোনারক বন্দরের বিখ্যাতি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। এখনও এখানে ওখানে বহু মন্দিরের ভগ্নাংশ, ইষ্টকনির্মিত গৃহাদি ও উন্নত গ্রামীন সভ্যতার প্রমাণ মেলে। দূরাগত বাণিজ্যবহর, তীর্থযাত্রী ও দর্শকের কলরোলে একদিন এই স্থানের গুরুত্ব সাড়ম্বরে ঘোষিত হ'ত। কাজেই তৎকালীন রাজার মনে এমনি এক বিখ্যাত স্থানে অনিন্দ্যসুন্দর বৃহদাকার এক মন্দির প্রতিষ্ঠার বাসনা জাগা খুবই স্বাভাবিক। বিদেশীদের বড় বড় বাণিজ্যপোত এসে লাগত কোনারক বন্দরে। দূর সমুদ্র থেকে এই বৃহৎ মন্দিরের চূড়াটি লক্ষ্য হ'ত জাহাজের ক্যাপ্টেনদের। তাঁরা এর নামকরণ করেছিলেন—ব্ল্যাক প্যাগোডা। তারপর কালের গতিতে নদী-মুখ বালুকাপূর্ণ হয়। চন্দ্রভাগা নদীর গতিপথ পালটায়। দেখতে দেখতে কোনারক বন্দরের বিখ্যাতির সূর্যদেবও ম্লান দিগন্তে নিদারুণ দৈন্যে অস্তমিত হয়।

সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন এই দেবদেউল অশিক্ষিত-শিক্ষিত জনসাধারণের আধ্যাত্মিক তথা সামগ্রিক চিন্তার মহান

শিক্ষকের পবিত্র ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতার ছটায় তখন প্রায় সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত। জবা-কুসুম সর্বপাপঘ্ন সূর্যদেবের আবির্ভাব মুহূর্তে মিলিত পুণ্যার্থী ভক্তবৃন্দের সোল্লাস জয়-ধ্বনির সঙ্গে শঙ্খ-ঘণ্টা-দুন্দুভি-কাঁসর-রামশিঙ্গা-ডমরু-বাঁশরী-ভেরী-রুদ্রবীণা-মৃদঙ্গ-পাখোয়াজ-খঞ্জনী-ঢাক-জয়ঢাক ও নহবতের দূরবিস্তারী নিনাদে মুখরিত হত জল স্থল অন্তরীক্ষ। সঙ্গীতের জলসা, পণ্ডিতদের তর্ক যুদ্ধ, দূরাগত যাত্রীদের আলাপন, মল্লবীরদের ক্রীড়া প্রদর্শন, লোকনৃত্যের উল্লাসে—দেব দেউল প্রাঙ্গণ অহোরাত্র জীবনের স্পন্দনে ধ্বনিত হতো। আতুর দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল চারিদিকে বেষ্টন করে বিচিত্র বিপণিরাজি। গৃহস্থালীর তৈজসপত্র থেকে আরম্ভ করে মহার্ঘ বস্ত্র, অঙ্গরাগ, পাথুরে মূর্তি, ধাতব শিল্প, হস্তীদন্ত শিল্প, শয্যাদ্রব্য, চর্মপাদুকা, শিবিকা, কত সব দ্রব্য সাজান থাকত থরে বিথরে। বড় বড় সভা সমিতির অনুষ্ঠান হত এখানে। মনোরম রঙের ঝালরে ঢাকা হাওদায় সুচিত্রিত হস্তীর পিঠে চড়ে মাঝে মাঝে আসতেন রাজা স্বয়ং পড়ন্ত রোদের বিকেলে। শাস্ত্রপাঠ হতো, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন। সন্ধ্যায় আরম্ভ হতো আরতি। নৃত্য পটিয়সী সুঠাম বরবর্ণিনী সেবা-দাসী ও দেবদাসীদের অপূর্ব নৃত্যগীতে উপস্থিত সকলের মনে আনন্দের লহরী বইত। আর লক্ষ ঘৃত প্রদীপের স্নিগ্ধ রশ্মিতে ঝল-মল করত সমস্ত মন্দির—সারাসন্ধ্যা।

সেদিনের অসংখ্য চিত্তজয়ী খোদিত কাব্য সূর্যপ্রতীম সূর্যমন্দির আজ কোনারকের বিশুষ্ক ভূগোলে ধূসর স্মৃতির শতছিন্ন বালাপোষ গায়ে প্রধান অপরাধীর মতো করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অসীম শক্তিধর মহাকাল যে কি নির্মম তা যদি প্রত্যক্ষ করতে হয় তবে কোনারকের সূর্যমন্দির একবার না দেখলেই নয়।

রচনাকাল : ১৯৭৮

'অচলায়তন' প্রসঙ্গে

সন ১৩১৮ঃ আশ্বিনের 'প্রবাসীতে' সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথের' অচলায়তন। তৎকালীন নানান পত্রিকায় বইটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনাগুলি প্রশংসা অপেক্ষা তিরস্কারের দিকে বেশী গিয়েছিল। অবশ্য এখনও পর্যন্ত 'অচলায়তন' নিয়ে ঝড় যে মাঝে মাঝে ওঠে না তা নয়, বরং ঝড় উঠলে খুবই প্রবলভাবে সেটা দেখা দেয়। বামপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, সাধারণ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর লোক বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিয়ে দ্বন্দযুদ্ধে নামেন নিজ নিজ পক্ষে সমর্থনে। তারপর যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয় সেটা অনেকেই দেখে থাকবেন। যাই হোক আমি সে সব প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। 'অচলায়তন' নাটকটির মূল সুরগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠককে নাটকটির অন্তর্নিহিত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।

"কতকগুলি বিশেষ শব্দ সমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না, তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের কাছেই জড়াইয়া পড়ে" এই সাধারণ সত্যটির প্রতি দৃষ্টি রেখে রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' লেখেন। 'অচলায়তন' অর্থ এই নয় যে অনড় অচল এক পাষাণ-প্রাসাদ, যেখানে নেই কোন আলো কোন প্রাণ, সর্বদা যেখানে ভয়—এই বুঝি এল নতুন কিছু, যা পুরাতন তাই শাশ্বত, যা নতুন তাই অবজ্ঞেয়—ঠিক তা নয়; 'অচলায়তন'—ধ্যান-ধারণা-কর্ম-ভক্তি সব কিছু যখন মানুষের মনে এমন ভাবে স্থান করে, যার ফলে সে সেই বিশেষ ক্ষেত্র হতে আর এক পাও এগিয়ে যেতে অসমর্থ হয়, তার দ্বারা সংঘটিত হয় না

কোন কাজ, যে কাজে প্রাণ থাকে, জ্ঞান থাকে, থাকে ভক্তি—সর্বোপরি এগিয়ে যাওয়ার একটা মহান মত্ততা, তখনই সে নিজে নিজের কাছে হয়ে উঠে 'অচলায়তন'। বিশেষ করে আমাদের মনোমন্দিরই যখন সকল কিছু প্রেরণার উৎসভূমি। মন যখন বিশেষ একটি বিষয়ে বড় বেশী মনোযোগী হয়ে পড়ে তখনই কল্যাণ সেখানে থেকে নির্বাসিত হয়। সেই কল্যাণ নির্বাসিত হয় বলেই বাহ্যিক আড়ম্বরে এমন একটা ভড়ং প্রকাশিত হয় যেটা হয়ে দাঁড়ায় মুখ্য—তার ভিতরকার প্রাণময়ী কল্যাণ মূর্তি হয়ে দাঁড়ায় গৌণ, এবং ক্রমশ অবলুপ্ত হয়—তখনই ঠিক ঘোর অকল্যাণ। অন্ধতা এসে যায়, দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারিয়ে যায়। আত্মচিন্তাকে যখন কেউ সবচে' মহৎ চিন্তা বলে মনে করে, তখন বোঝা যায় যে তার চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বনাশা ভাঙন ধরেছে; আর সেই সর্বনাশকে উপস্থিত করা হয়েছে 'অচলায়তন' নাটকের প্রারম্ভে। ভাঙনের পরিপূরক গড়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই নাটকের সমাপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ এই নাটক লেখেন আষাঢ়ে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, মিলিয়ে যে গ্রীষ্মঋতু, যার প্রকাশ শুধু প্রচণ্ডতায়, তারই রূপ ব্যক্ত হয়েছে 'অচলায়তনের' অধিবাসীদের কার্যকলাপে। মহাপঞ্চক সেই প্রাণহীন মননপ্রধান কার্যকলাপের প্রধান পুরোহিত। গ্রীষ্মের খর তাপের মাঝে যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে নবীন মেঘের সুর, পঞ্চক যেন তাই, যার উপস্থিতি মনে পড়িয়ে দেয় বর্ষার মত্ততা, যে এনে দেয় রুক্ষতার মাঝে প্রসন্ন ধারাপাত। আবর্জনা, সময়-বিশুষ্ক রিক্ততাকে নিয়ে যায় দূরে ভাসিয়ে – নতুন তৃণাঙ্কুরের শ্যামলিমায় বর্ষিয়সী ধরিত্রীর মুখ খুসিতে ঝলমল করে।

রবীন্দ্রনাট্যের বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ অর্থাৎ তত্ত্ব প্রাধান্য যার ফলে কাহিনী, আবেগ সব কিছু অপ্রধান হয়ে, তাত্ত্বিক সংলাপ-প্রধান হয়, সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় না, সেদিক থেকে 'অচলায়তন'

অনেকটা সজীব, যদিও পুরোপুরি নয়। প্রথম ভাগ অপেক্ষা শেষভাগে এই সজীবতা ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়।

প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে যখন কোন বস্তু আর সৃজন করতে পারে না, মৃতে পরিণত হয় তখনই তার অপসারণের প্রয়োজন ঘটে—আর এই অপসারণের জন্য আসে নতুনের দল—কর্মক্ষমতায় যারা বলবান সেই শোনপ্রাংশুদের দল। জগদ্দল পাথর সরিয়ে রুদ্ধধারাকে মুক্তধারা করে। মননের ক্ষেত্রে, ধর্মআচরণের ক্ষেত্রে যে কোন ক্ষেত্রেই হোক্ না কেন—এই শোনপ্রাংশুদের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে একটু উৎকট হয়ে দাঁড়ায় হয়তো তাদের কার্যকলাপ, একটু অসংযমী হয়ে পড়ে তাদের গতি প্রকৃতি, কিন্তু জড়ত্ব বিনাশনে যুক্তিযুক্ত না হলেও এ রকম কার্যকলাপের সামান্য প্রয়োজন থেকে যায়—সেখানে অধিকন্তু ন দোষায়। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে পাথর সরানোর পর অবরুদ্ধ ফল্গু ধারা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। সে কাজ যাতে বাধা বিপত্তি অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই হয় তার জন্য দাদাঠাকুর বলেন—বসিয়ে রাখব না তোদেরকে, ভাঙাভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যা।'

শোনপ্রাংশুদের চরিত্র বিচারকালে এইটেই প্রধান চোখে পড়ে। কাজ করা যেন তাদের নেশা। কোন কিছুতেই তারা আত্মস্থ হতে পারেনা—শুধু কাজ চায়। তা সে ভাঙারই হোক কিংবা গড়ার। রবীন্দ্রনাথ এখানে এক চরম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নাটকটির প্রারম্ভে আমরা দেখি ধ্যান-ধারণা-মননের প্রতি এক হিংস্র ভক্তির প্রাবল্যে সেখানে কর্মের প্রবেশপথ রুদ্ধ। ঘটনার সংস্থাপনে তারপর দেখানো হলো নাটকের মধ্যে কর্মশূন্য স্থান এক বৃহৎ বিশুষ্ক ভূমি যেখানে কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না। সেই জন্য তার পতন হয়, আসে নবাগতেরা। পুরাতন প্রথা বিদায় নেয়, কিন্তু মানুষ রয়ে যায়। তাই যখন সেই পুরাতনরা নতুনদের সঙ্গে একাত্ম হয় তখনই

আসলে 'অচলায়তনের' দেয়াল ভাঙার কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু নাটকের একেবারে শেষাঙ্কে আমরা দেখছি যে শোনপ্রাংশুরা বলছে—আর তো পারিনে। দেয়ালতো একটাও বাকী রাখিনি। এখন কী করব, বসে পা ধরে গেল যে।'—

এই যে কাজ করার নেশা এর প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু স্থির হ'ে বসারও প্রয়োজন কম নেই। যে মুহূর্তে এই বোধটি না আসবে ততক্ষণ কিছুতেই কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে না। এখানে দাদাঠাকুরের মত জ্ঞানী লোকেরও প্রয়োজন আছে। জ্ঞান ও কর্ম একে অপরের পরিপূরক।

১৯১৮ সালে লেখা এই নাটকটি যে বিষয়ের অবতারণা করেছিল আজ তা ভালভাবেই দেখছি চোখের সামনে। আজকের পৃথিবীতে আমাদের সামনে কর্মই হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম—'Work is workship. শোনপ্রাংশুদের মত সকলেই আজ একদণ্ডও স্থির থাকতে রাজী নয়। শোনপ্রাংশুদের যেমন দরকার আছে, তেমনি দরকার আছে দভকদের, মহাপঞ্চকের। রবীন্দ্রনাথ যে কী এক সুস্থির সমন্বয়ের মধ্যে এই নাটকের বক্তব্য শেষ করেছেন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

'অচলায়তন' নাটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে বইটিতে হিন্দু-ধর্মের মন্ত্রগুলির প্রতি নির্মম আঘাত করা হয়েছে—'অচলায়তন' পড়ার পর কারো মনে যদি একথা জাগে তবে সেটা নেহাৎ বুদ্ধিহীনতার পর্যায়ে পড়ে। কারণ যে মন্ত্রতন্ত্রগুলিকে নিয়ে বা তার অনুসরণে ব্যঙ্গভরে এগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal হতে সঙ্কলিত। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে তান্ত্রিকতা বা কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি আক্রমন তো নয়ই এবং হিন্দুধর্মের কথাও নিছক অবান্তরতা। কারণ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ

—অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না—যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।—মন্ত্রের মাহাত্ম্য আর যেই অস্বীকার করুন রবীন্দ্রনাথ যে অস্বীকার করতে পারেন না এ কথা বলা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। ঠাকুরবাড়ীর ঘরোয়া পরিবেশ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রবীন্দ্রনাথের জীবন যাঁরা জানেন তাঁরা একথা মনে স্থান দিতে পারেন না।

'অচলায়তনে' নাটকের সুমহান বক্তব্যকে যদি এমনিতর দৃষ্টিতে দেখা হয় তো এর সত্য মূল্য উপলব্ধি করা যাবে না। ছোট এই নাটকটির মধ্যে কী বিচিত্র না সব চরিত্র। এত অল্প স্থানে মানব—প্রকৃতির এক একটি দিককে কী চমৎকার ভাবেই না চিত্রিত করা হয়েছে। সুভদ্র—দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সূত্র হতে সে যেন স্বশরীরে নেমে এল। পাষাণপুরী 'অচলায়তনের' বাইরের জগৎটা তার দেখবার সাধও যত দেখে ফেলে ভয়ও তত। কেবলি জিজ্ঞেস করে পঞ্চককে—'কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?' একদিক সংস্কার অন্যদিকে মুক্তির ডাক। মুক্তির ডাকে যখন সে সাড়া দিয়ে তার স্বরূপ দেখল, অমনি সংস্কার এসে হাত ধরে নাড়া দিল। জন্মাল ভয়। তার ফলে পারল না এগিয়ে যেতে। দ্বিধার জালে পা জড়াল। সংস্কার-দৈত্যের দৌরাত্ম্যে সমাজের কত 'সুভদ্র' যে নতুনকে আহ্বান করতে গিয়েও পারে না তার তো ইয়ত্তা নেই।

নদীর জলধারা যেমন মোহনায় দ্বি-ধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরের বুকে হারায় আর তার মাঝে গড়ে উঠে ব-দ্বীপ তেমনি মহাপঞ্চকের জ্ঞান, দর্ভকদের ভক্তি কর্মের মহাসাগরে বিলীন হয়ে নতুন বদ্বীপের

জন্ম দেবে। তখন একের দোষ অন্যের গুণের সংস্পর্শে এসে সংশোধিত হবে। দর্ভকদের মেরুদণ্ড-বিহীনতা, শোনপ্রাংশুদের ভক্তিহীন কর্মচাঞ্চল্য আর সর্বোপরি মহাপঞ্চকের প্রাণহীন সাধনা—নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের যে ভয়াবহ সিদ্ধি—সেটা সৃষ্টিশীল হয়ে মিলনের সুষ্ঠুতায় উদ্‌যাপিত হবে।

রচনাকাল: ১৫৬

শিবু মাঝির গান

গানের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার মনের কথা বলে। সে কথায় থাকে তার জীবনের বিচিত্র চিন্তা ও অনুভূতি। কোন গভীর ভাব, জীবনদর্শন, সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার অন্যের কাছে বোঝাতে হলে যে পরিমাণ সময়, বক্তৃতা প্রভৃতির দরকার হয় অতি অনায়াসে গানের সাহায্যে সেই সব উপস্থাপিত করা সম্ভব। একটি জাতিকে পুরোপুরিভাবে জানতে হলে সেই জাতির অনেক কিছুকে দেখতে হয়, শুধু ভাষা জানলেই হয় না, তাঁদের সম্পর্কে বই পড়ে জ্ঞান লাভ করলেও তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এমন কি তাদের মাঝে বসবাস করলেও হয়তো সবটা জানা যায় না, যদি না সেই জাতির গানকে বোঝা যায়, তাদের মুখে শোনা যায়। আমার মনে হয় শুধু মাত্র গান গাইবার পদ্ধতি দেখে ও গান শুনে একটি জাতির সম্পর্কে বেশ খানিকটা ধারণা করতে পারা যায়, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য, জীবন-যৌবন, তাদের চিন্তা, প্রবৃত্তির সম্পর্কে। এমন না হতেও পারে যে গানের অন্তর্গত সবটা বোঝা দরকার, তবে বুঝলে নিশ্চয়ই ভালো।

অন্ধ ভিক্ষুক শিবুশঙ্কর মাঝির কয়েকটা গান শুনে বুঝবার চেষ্টা করে দেখলাম তাদের কথা। সাঁওতাল, অর্থাৎ আমরা শহরে বসে যা দেখি—একটা অদ্ভুত জাতি। সভ্যতার ক্রমবিবর্তন যাদের জীবনধারায় বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হল না অথচ যারা নির্দিষ্ট গণ্ডীতে বসবাস করে না, বিভিন্ন স্থানে যাদেরকে যাতায়াত করতে হয় জীবিকার প্রয়োজনে, ফলশ্রুতি স্বরূপ সভ্যতার আলোকরশ্মির স্পর্শ যারা প্রতিনিয়ত পাচ্ছে, তারা অন্তরের কোন ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে পার্থিব ভোগ সুখের প্রতি এমনতর উদাসীন—এটা চিন্তা করে বুঝে ওঠা দুষ্কর।

প্রতিবেশিনীর কাছে

দারিদ্র্য, দুঃখ, সরলতা যাদের ভূষণ, সে জাতির চিন্তার পরিচয় পেতে, বর্তমান কালের আমাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। হাজারো সমস্যায় আকীর্ণ আমরা সূর্যোদয় থেকে চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত মানসিক উদ্বেগে, অর্থনৈতিক সমস্যায় শারীরিক ক্লিন্নতায় জর্জরিত। এমন নয় যে সাঁওতালদের কোন সমস্যা নেই; কিন্তু সেই সমস্যার জালে তারা আমাদের -তো খুব জড়িয়ে পড়ে নি। এ কথাটাই এখানে আলোচনা প্রসঙ্গে উত্থাপিত হল। নীচের গানগুলি থেকে অভূতপূর্ব না হলেও সুন্দর এক স্বাদ পাওয়া যায়। নিরাভরণ, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে যে তারা অভ্যস্ত, গানের প্রতিটি চরণ সে বিষয়ের যথেষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে। উপমাপ্রয়োগে স্বাভাবিকতা, রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে চমৎকার ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। গানগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে এগুলিকে পুরোপুরি সাঁওতালী গান বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা হয়। যদিও পাঠান্তে বাংলা গান বলেও স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। দ্রুত কোন পরিবর্তন না হলেও সাঁওতালদের সাজসজ্জা, আচার ব্যবহার, কথোপকথনে কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয় লক্ষিত হয়। তবে সবচেয়ে লক্ষনীয় পরিবর্তন তাদের ভাষার ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষার দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটেছে সাঁওতালী ভাষায়, বিশেষ করে বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে। ভাষাগত কোন আদিম গোঁড়ামি ভাষার ক্রমবিকাশের পথে অন্তরায় হচ্ছে না।

আরো একটা বিষয়: সাধারণত ঢোল, মাদল, বাঁশী ব্যবহৃত হয় গানের অনুষ্ঠানে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও নতুন বাদ্যযন্ত্রের স্থান হচ্ছে। তবে একেবারে বাজার হতে কেনা আনকোরা নতুন বাদ্যযন্ত্রের দিকে ঝোঁক নেই। শিবু মাঝির হাতে দেখলাম একটা স্বকপোলকল্পিত যন্ত্র, যেটাকে বেহালা বললে বেমানান হলেও, না বলে সহজে বোঝবার উপায় নেই। একটা ছাতার বাঁটকে অবলম্বন করে প্রান্ত দেশে নারকেলের মালার উপর পাতলা চামড়া দিয়ে 'সাউণ্ড বক্স' তৈয়ারী

করা হয়েছে। তারপর একটি সরু তার অন্য প্রান্ত থেকে এসে ঐ 'সাউণ্ড বক্সের' উপর দিয়ে একেবারে একটি বড় পুঁথিতে শেষ আশ্রয় নিয়েছে। ছাতার বাঁটের বাঁকা দিকটায় গোটা দুই ছিদ্র করে তারকে টানটান করার উপায় রাখা হয়েছে। যন্ত্রটি একটি ছোট ধনুকাকৃতি ছড়ের সাহায্য বাজান হয়। গম্ভীর সুরের বাঁশীর মতো একটি চমৎকার সুর সৃষ্টি করতে যন্ত্রটি সক্ষম।

১নং গানে মানুষের অনিত্য অস্তিত্বের কথা আশ্চর্যজনকভাবে অকপটবাক্যে প্রকাশিত হয়ে যে ভাবের সৃষ্টি করেছে, তা যে কোন রসবেত্তাকে বিষাদ-ময়তায় আতুর করে তোলে। অথচ গানের কথাগুলির মধ্যে নতুন কিছু নেই। কোন চমক বা অশিক্ষাজনিত উপলব্ধির অগভীরতার কোন পীড়াদায়ক প্রকাশও নেই। একটি সপ্রাণ, প্রায়-ভ্রাম্যমান জাতি কিভাবে এমন সমাহিত-চেতনার গণ্ডীতে অনায়াসে পদচারণা করতে পারে—সে প্রশ্ন প্রতি মুহূর্তে তীব্রতর হয়।

বিবাহ উপলক্ষে কন্যার স্বামীগৃহে যাত্রাকালীন বেদনাময় বন্ধনমুক্তির চিরন্তন অনুভূতি ২নং গানের প্রতিটি শব্দে ধ্বনিত।

ঘরোয়া কলহের পর পুত্রের অভিমানজনিত মনোবেদনার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে ৩নং গানে। শুধু তাই নয়, অতি সংক্ষিপ্ত পরিবেশে এমন নাটকীয় পটপরিবর্তন আছে, যা নিপুণ দক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। পুত্রের আক্ষেপ, আত্মহত্যা, মৃত্যুকালীন জলভিক্ষা অবশেষে পরিবারের সকল প্রিয়জনের নিধনকারীর উদ্দেশ্যে বিলাপ, সফল নাটকীয় পরিমণ্ডল রচনায় সহায়ক হয়েছে। গানটির ৩য়, ৪র্থ, ৫ম লাইনে পূর্ব-বঙ্গ গীতি কবিতার অত্যন্ত পরিচিত কয়েকটি কলি প্রায় অপরিবর্তিত ভ্রাণ নিয়ে উপস্থিত এবং শেষের দুই লাইনে বাংলাদেশের প্রিয় ও পরিচিত একটি ছড়ার

"বোন কাঁদেন, বোন কাঁদেন খাটের বাজু ধরে,
সেই যে বোন বলে গেছে ভাতার-খাকী বলে।"

বিশিষ্ট সুরটি অন্তর স্পর্শ করে।

৪নং গানে একাধিক স্ত্রী ভরণপোষণের ক্ষেত্রে সপত্নীদের মাঝে যে শাশ্বত মনোমালিন্য থাকে তার কথা বলা হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নিমিত্ত বিচারের আশ্রয়গ্রহণ অবশেষে ইপ্সিত মিলনের মধ্যে পরস্পর শান্তভাবে 'শালুক ফোটে' ও 'কাপড় ছাড়িল' উক্তিতে শেষ হয়ে নির্মল শারদীয় আকাশের মতো প্রসন্নতায় ভরপুর হয়ে উঠেছে।

১॥ মরণের গান

সোনার অঙ্গ দেহ মাটি লিচ্ছে
বড়মা লিচ্ছে
আর আসতে একা যেতেও একা
মরণকে সঙ্গে দিবে না।
যখন হল হয়ে মরে গেলে
কত কাঁদবি কত ভাববি।
সোনা ভাঙল সোনা জুড়ে
কাঁসা ভাঙল কাঁসা জুড়ে
সাধের জীবন ভাঙলে, ফিরে জুড়বে না।

২॥ বিয়ার গান

বারো বছরের বর
তের বছরের কনে
বলি অহে দেখোরে বর কন্যে
হাতে লিয়ে তেলের মালি সকালে চান বিটিগো
কাকে দিলে গো মা হলুদরাঙা সরু কাপড়
শাশুড়ি মা দিলে আভরণ।

প্রতিবেশিনীর কাছে

ছোট থেকে বিয়ে হলো
ছোট বড় গেরাম দেখে পরাণ উড়ে যায় ;
গুড় বিকায় শালে
মেয়ে বিকায় কোলে
ধান চাল বিকায় বার মাসে ॥

৩ ॥ অভিমানের গান

মা হয়ে এমন কথা বলেরে
বাবা হয়ে এমন কথা কয়
দে সে রে শালুক লতা
গলায় দড়ি দিব
ঘটির প্যান ডুবি মরিব ।
আনো সে রে পানি তুলো সে রে পানি
পানির কিবা দোষ ।
মা কাঁদে বাপ কাঁদে মাথায় হাত দিয়ে
সদরের বোন কাঁদে ধূলায় লোটায়ে ।

৪ ॥ সতীনের গান

সতীন সতীন বল না
সতীনের মেল নাই
সাদা কাগজ কিনিব
দুই সতীন মেল করিব ।
বাড়ীর নামু পুকুরে
দুই সতীন কাপড় কাচিল ।
যেমন যেমন শালুক ফোটে
তেমন তেমন কাপড় ছাড়িল ।

রচনাকাল : ১৯৬২

মুদ্রাদোষ

অমা, কি সব্বনাশ! মিনু তাড়াতাড়ি তোর প্রবীরদাকে একটা আসন পেতে দে।

মিনু: সামনে পরীক্ষা। ডাং করা বই-পত্তর ফেলে বাইরে আসতে আসতে আবার চীৎকার করে উঠলেন মিনুর মা হেমপ্রভা—কি করছিস মিনু? তাড়াতাড়ি আয়।

মিনু রণিয়ে এসে সামনে দাড়ালো। ঝাঝালো গলায় মাকে শুধোলো—হলো কি? এত চ্যাচাচ্ছ কেন?

অমা কি সব্বনাশ, চ্যাচাব না? মেয়ের কথা শোন। বলে কিনা চ্যাচাচ্ছি কেন? প্রবীর বি-এ পাশ করল ডিষ্টিংশন পেয়ে, নিজে এসেছে খবর দিতে—এত বড় সুসংবাদ। কি সব্বনাশ—চ্যাচাব না।

মিনুর মুখে হাসির আয়োজন—তাই নাকি প্রবীরদা। তা খালি হাতে যে বড়, মিষ্টি কই?

কি সব্বনাশ, তুই বলছিস কি মিনু—প্রবীর বাড়ী বয়ে মিষ্টি নিয়ে খবর দিতে আসবে, না আমরাই ওকে মিষ্টি মুখ করাবো? কি সব্বনাশ, এখন কি যে করি। উনি আবার ঠিক এই সময় কোথায় বেরিয়ে গেলেন। বসো বাবা প্রবীর, বসো। মিষ্টি মুখ না করিয়ে ছাড়ছি না। কি সব্বনাশ, প্রবীর বি-এ পাশ করেছে। আমাদের সেই এতটুকু প্রবীর, যাকে আমরা ন্যাংটো থেকে দেখছি,—কি সব্বনাশ।

মায়ের কথা বলার ধরণ দেখে মিনু চোখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল।

পরীক্ষার রেজাল্টের কথা বলতে এসেছিল প্রবীর প্রতিবেশী মাসিমার কাছে। মাসিমা আনন্দে ডগমগ হয়ে প্রবীরকে অভ্যর্থনা

করতে গিয়ে যে সব কথা বলছিলেন, কেউ শুনলে ভাববে যে বি-এ পাশের সংবাদে সত্যই তিনি মর্মাহত হয়েছেন। কিন্তু সত্যি তা নয়। 'অমা কি সব্বনাশ' হচ্ছে মাসিমার মুদ্রাদোষ। এবং এই মুদ্রাদোষটি সব সময়ও থাকে না। অত্যন্ত আনন্দঘন মুহূর্তে মুহুর্মূহু তিনি ঐ বাক্যটি উদ্গার করেন।

এমনি না হলেও মানুষ মাত্রেরই নাকি মুদ্রাদোষ থাকে, তা সে কথার ভঙ্গিরই হোক অথবা ব্যক্তিগত ভাবভঙ্গিরই হোক। স্বভাবের আওতায় এলে মুদ্রাদোষে তা পরিণত হবে। মজার কথা হচ্ছে, এই মুদ্রাদোষ যার আছে সে কিন্তু ঠিক মতো বুঝতে পারে না সব সময়। কেউ কেউ মাঝে মাঝে ভেবে আরাম পান যে তাঁর কোন মুদ্রাদোষ নেই। এও এক প্রকার মুদ্রাদোষ। মুদ্রাদোষ সম্পর্কে সচেতন থেকেও অনেকে এর হাত থেকে রেহাই পান না ক্ষেত্র বিশেষে।

প্রধানত না হলেও প্রথমত মুদ্রাদোষ সূচিত হয়—ব্যক্তি বিশেষের কোন কিছুর প্রকাশকালীন অসুবিধাকে আড়াল করতে গিযে। এদের মধ্যে কেউ বা অঙ্গভঙ্গী, কেউ বা কথার ভঙ্গীর খাদে পড়ে যান অতর্কিতে, অনভিপ্রেত ভাবেই। পরে সেটি অজান্তে অভ্যাসে পরিণত হয। ব্যক্তিত্ববান পুরুষ থেকে সাধারণ স্তরের মানুষ—কমবেশী মুদ্রাদোষ কিছু না কিছু এদের থাকবেই।

মুদ্রাদোষ দূরীকরণের উপায় হচ্ছে যখন এটি প্রথম প্রথম পরিলক্ষিত হয তখনই একে সমূলে বিনাশ করার জন্যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের উচিত মুদ্রাদোষগ্রস্থ ব্যক্তিকে সে সম্বন্ধে অবহিত করানো। ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায—প্রথমে সে স্বীকারই করবে না যে তার কোন মুদ্রাদোষ আছে।

জনৈক বন্ধুর বোনের বিবাহোপলক্ষে পরিবেশনাদি করার পর অধিক রাত্রি হওয়ায় বন্ধুর বিছানাতেই শোয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার বন্ধুবর ভাল গায়ক। আমাকে বললে—

তুই শুয়ে পড়, আমি আসছি। সারক্ষণ খাটাখাটনির পর যেই না শোয়া অমনি ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ ঘুমের ঘোরে মনে হলো কে যেন হারমনিয়ম বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই। অন্ধকারে তাকালাম। ঘুমটা বেশ ভাল করে ভাঙল। উঠে সুইচ টিপলাম। তাজ্জব কাণ্ড। একসঙ্গে সাতটা রীড টিপে কেউ যদি ধীরে ধীরে বেলো করে তা হলে যে রকম বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় সেই ধরণের আওয়াজ শুধুমাত্র বন্ধুবরের নাসিকা গহ্বর হতে অনর্গল বের হচ্ছে। ঘড়িতে দেখি চারটে বাজতে কয়েক মিনিট। বাকী রাতটুকু জেগেই কাটালাম। কারণ সহজেই অনুমেয়। পরদিন বন্ধুকে বলতে, হো হো করে হেসে উঠল। উলটে আমাকে বলল—হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষে আমি এসে দেখলাম তুই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছিস। স্বপ্ন টপ্ন দেখে থাকবি। আমার নাক ডাকে না। অসহায় লাগল। সত্যিই কোন প্রমাণ নেই। যে মানুষের নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো অভ্যাস সে কোন কালেই স্বীকার করে না যে ঘুমন্ত অবস্থায় সে নাসিকা গর্জনে অন্যের অনেক সময় আতঙ্কের কারণ হয়ে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়।

বাগভঙ্গিজনিত ও নাসিকা গর্জন সংক্রান্ত মুদ্রাদোষের প্রমাণ উপস্থিত করা অবশ্য বর্তমানে খুব অসুবিধাজনক নয়। একটি টেপ রেকডার নিয়ে ব্যক্তির অজান্তে যদি তার শব্দিত প্রয়াসগুলি টেপ করে নেওয়া হয় ও ধীর স্থির জাগ্রত অবস্থায় শোনানো হয়, তা হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। অবশ্য অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে নিজেরাই সচেতন। তাঁরা তো আগেভাগেই বলে বসেন—মশাই আমার আবার কতকগুলো মুদ্রাদোষ আছে। কেউ তার জন্য কিঞ্চিৎ লজ্জিত থাকেন। কেউ বা খুব সচেতন থেকে হঠাৎ কোন সময় মুদ্রাদোষের খপ্পরে পড়েন। এমনও লোকের কথা জানি যিনি বহু যত্নে কিছু আকর্ষণীয় মুদ্রাদোষ আহরণ করেছেন। জনৈক

শিক্ষক কথা বলতে বলতে হঠাৎ দু'একটা কথায় তোৎলামি প্রকাশ করেন—একটু আদুরে ঢঙের। মানানসই মুদ্রাদোষের দৌলতে ছাত্র সমাজে তিনি বেশ জনপ্রিয়। আর একজনকে জানি, তিনি এমন একটি অকৃত্রিম দাঁত-বের করা হাসি আয়ত্ত করেছেন যে প্রথম প্রথম যাঁরা দেখবেন তারা মোহিত না হয়ে পারবেন না। আমিও সেই সদা-হাস্যময় যুবককে দেখে আনন্দ পেতাম। কিন্তু যেদিন তার একমাত্র ভাই আত্মহত্যা করল সেদিন খবর নিতে গিয়ে দেখি ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে দাঁত-বের করে কাঁদছেন। ভদ্রলোকের মুদ্রাদোষ সেদিন আমার চোখে ধরা পড়ায় অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম।

প্রধানত আবেগ-বিহ্বল সময়ে মুদ্রাদোষ খুব প্রবল আকার ধারণ করে। আমার বাল্যবন্ধু চিন্ময় এসেছিল বহু দিন পর। চা খেতে খেতে এ কথা সে কথার পর চিন্ময়ের ভাই সংলাপের কথা ওঠায় বলল —ছোট বেলা থেকেই ভাইটার শরীর লিক্‌লিকে—এতে আজকাল পেটে ও এমন একটা এতে যন্ত্রণা পায় যে এতে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। তাই এতে ডাক্তার মুখার্জীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি এতে বললেন—এতে পেটে পাথর হয়েছে। এতে—অপারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে। এতে মা এতে-তে-তে তো খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। এখন এতে আমিও খুব এতে—তে-তে···। বন্ধুর ভাইয়ের রোগের বর্ণনা শুনতে শুনতে হাসাহাসি করা উচিত নয় জানি, কিন্তু চিন্ময়ের মুদ্রাদোষ 'এতে' এবং দ্রুত উচ্চারণকালীন 'তে' পুনঃ পুনঃ শুনতে শুনতে এই হেসে ফেলি তো সেই হেসে ফেলি। হাসি সামলানো দায়। অথচ ভাবুন তো হেসে ফেললে কী কেলেঙ্কারী।

সেদিন ফেরার পথে শ্রীপতি বাবুর সঙ্গে দেখা। একটা প্রেসে বসে খবরের কাগজ হাতে রোদ পোহাচ্ছেন। চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন—কি খপর? আপনার যে আজকাল পাত্তাই পাওয়া যায় না। খলেড়ে কি?

বললাম—মাংস।

উনি যেন ঐ কথাটি শোনার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। বললেন —দেখে শুনে নিয়েছেন তো ? একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন কি গেছেন। অমনি আপনার বাসি মাংসের টুকরো মিশিয়ে দেবে। আমার সঙ্গে তো পারে না। গত পরশু দিন আপনার মাংস নিয়ে গেলাম ; লেডিজ নয়—জেণ্টল ম্যানেরই মাংস। হলে কি হয়। আপনার মাংস মশাই কিছুতেই আর সেদ্ধ হতে চায় না। প্রেসার কুকারেই এক ঘণ্টা লাগল। তবে আপনার মাংস খেতে কিন্তু মন্দ লাগেনি।

বাড়ী ফিরে হাসতে হাসতে গৃহিণীকে বললাম—তোমার মাংসটা একটু মাখা মাখা করে রেঁধো। শুনে মল্লিকা ফিক্ করে হেসে বলল —আর তোমারটা বুঝি ঝোল ঝোল করে ?

কলেজের প্রফেসর মজুমদারের কথা মনে পড়ছে। পড়াচ্ছেন তাপ মাত্রার চরম স্কেল। দুশো ছেলেমেয়ে আমরা ঠাসাঠাসি বসে ফিজিকস্ গ্যালারীতে। উনি বলে চলেছেন—চালসের থিয়োরী থেকে আমরা জানতে পারি, তাই না—যে $t^{\circ}c$ তাপমাত্রা হ্রাস পেলে কিছু পরিমাণ গ্যাসের আয়তন, তাই না— $V = VO\left(1 - \frac{t}{273}\right)$ তাই না—। যদি তাপমাত্রা $O^{\circ}C$ থেকে 273° হ্রাস করা যায়,—তাই না আ অর্থাৎ তাপমাত্রা—273° হয়, তবে উক্ত আয়তন $V = VO\left(1 - \frac{273}{273}\right) = O$ তাই না—আ— আ—। দিন কয়েক পর করিডর দিয়ে আসছি। সহপাঠিনী তাপ্তীকে জিজ্ঞেস করলাম—এখন কার ক্লাস বলতো ? বললো— তাড়াতাড়ি আয়। 'তাই না' আবার বেশী দেরী হলে ঢুকতে দেন না।

সেদিন ক্লাশে বসে গুণেছিলাম। এক পিরিয়ডে উনি ১৭২ বার 'তাই না' বলেছিলেন।

মুদ্রাদোষ যে কয়েকটি শব্দ দিয়েই প্রকাশিত হয় এমন কথা নয়। মুদ্রাদোষ ভিন্নজনে ভিন্নরূপ ধারণ করে। জনৈক বন্ধুর মুদ্রাদোষ বিদেশী কবি, সাহিত্যিক, পুস্তকের নামের উচ্চারণকে একটু বিশিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করা। ৯১ বছর বয়সে আমার প্রিয় গল্প লেখক মম মারা গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে মমের কথা ওঠায় উনি তো হাঁ হাঁ করে উঠলেন— মম নয়। আপনারা কেবল মম আর মম বলবেন। আসলে ওর নাম সামারচ্চাট মঘাম। ফরাসীরা আদর করে ডাকত—মম।

তবু ধরণী দ্বিধা হল না। এই বিচিত্র উচ্চারণের জন্য উনি একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। তাই আর কথা বাড়াই না। ওঁর কাছেই শুনেছি রোমা র‍ল্যার, জঁা ক্রিস্তফ্ নয়; রোমান রোলার জন খৃষ্ট ফুর। ফরাসী কবি র‍্যাবো বললে উনি রেগে থাপ্পা, ঠিক উচ্চারণ নাকি হ্যাবো। এই ভাবে উনি অনর্গল রোলার চালিয়ে সব কিছু দুমড়ে মুচড়ে দিতেই অভ্যস্ত। এতৎসত্ত্বেও যদি আপনার সঙ্গে ওঁর উচ্চারণ হঠাৎ মিলে যায় তাহলে উনি কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেন—এই উচ্চারণটা বোধ হয় ক্যাম্ব্রিজের? অক্সফোর্ড কিন্তু Blouse কে 'ব্লাউজ' বলে না, বলে 'ব্লুজ'।

মোটামুটি মুদ্রাদোষ দু' প্রকারের। প্রথমত এটি ব্যক্তির হীনমন্যতা থেকে জন্মলাভ করে। দ্বিতীয়তঃ অহংমন্যতা থেকেও অনেকক্ষেত্রে মুদ্রাদোষের উৎপত্তি হয়। নিকট সম্পর্কীয় এক আত্মীয় অধুনা এই দ্বিতীয় প্রকার মুদ্রাদোষের পাল্লায় পড়েছেন। একটা কথা আছে—খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হ'ল এঁড়ে গরু কিনে। সম্প্রতি উনি একটা নাটক লিখে গণ্ডগ্রামের নাট্যকার হয়ে বসেছেন। ফলে ওঁর ধারণা উনি রাতারাতি দ্বিজু রায়ের সমগোত্রীয় কেউ কেটা। এখন কোন কথা বলতে গেলে, যত সামান্য সেই কথাই হোক না কেন, মাঝে মাঝে শ্রোতার বুদ্ধি সম্পর্কে বা তার গ্রহণ ক্ষমতা সম্পর্কে

সন্দিহান হয়ে পড়েন। যেমন ধরুন উনি বলছেন—বুঝলে ভাই এবার-কার এই শীত একটু নতুন ধরণের। কারণ হচ্ছে সূর্যের শরীরে একটা বিস্ফোরণ হয়ে সেখানে একটা হিম ভাব সৃষ্টি হয়েছে। এতদূর বলে শ্রোতার দিকে একপলক তাকিয়ে সকৌতুকে মৃদু হেসে নাটকীয় ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করেন—clear হচ্ছে? প্রশ্নটি শুনে শ্রোতা প্রথমে কুঁচকিয়ে যায়। তারপর আমতা আমতা করে নাবালকের মতো বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। পরমুহূর্তে উনি ধরেন—পরশু রেডিও থেকে খবরটা শুনলাম। জাপানের কোন এক অবজার্ভেটারীব থেকে ব্যাপারটা নাকি জ্যোতির্বিদরা প্রত্যক্ষ করেছেন। clear হচ্ছে? আমিও ছিলাম সেই আসরে। মনে মনে ভাবলাম এত বড একটা তথ্য এত সহজ সুন্দর ভাবে পরিবেশন করলে clear না হয়ে থাকতে পারে কি?

মুদ্রাদোষ যেমন অনেক সময় চিত্তাকর্ষক হয় তেমনি মাঝে মাঝে বড় বিরক্তিব্যঞ্জকও হয়। আমার আর এক বন্ধুর মুদ্রাদোষ সময সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতনতা। তার যাবতীয় কথাবার্তা হঠাৎ এসে থমকে যায় যদি না সময়গত বিষয়টি যথাযোগ্য ভাবে স্মরণে আসে। বেশ খানিকটা বলে এসে হঠাৎ সময়ের উল্লেখ কালে বিস্মৃতি জনিত অস্বস্তিতে ছটফট করে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকেও তীব্র বিপদে ফেলে সব কিছু মাটি করে দেয়। তার বক্তব্যের একটু নমুনা দিলেই বুঝবেন। ব্যাপারটা বেশ 'clear' হবে।

শ্যামবাজার থেকে বাস ধরে সোজা হাওডা ষ্টেশনে এলাম। বৃষ্টিও বলে আজ বৈ কাল হবো না। যাই হোক কাক ভেজা হযে টিকিট ঘর থেকে টিকিট কিনে গাড়ী ধরবার জন্য প্লাটফরমের দিকে ছুটলাম। কিন্তু ছোটাই সার হলো। গাড়ীটা তার দু' মিনিট আগে ছেড়ে দিয়েছে। তখন বোঝ আমার অবস্থা। পরের গাড়ীটা নাকি ঘণ্টা দেড় পর অর্থাৎ পাঁচটা—মানে পাঁচটা উনিশ; না, না

পাঁচটা—দাঁড়া, একটু মনে করে দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ পাঁচটা চব্বিশ—না চব্বিশ না, মানে পাঁচটা ঠিক কতো। আর একটু ভাবি……।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বললাম—তুই বল তারপর কি হলো ?

—ন্না। গাড়ীটা ঠিক ক'টায় মনে করতে পারছি না। বললাম—তাতে কি হয়েছে। পাঁচটা কয়েক মিনিটে গাড়ীটা তো ছাড়ল। তারপর বল।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। সেই যে পাঁচটা উনিশ না পাঁচটা চব্বিশের পাল্লায় পড়ল, সেখান থেকে গাড়ীকে নড়ায় কার বাপের সাধ্যি। মুদ্রাদোষের মহিমা দেখে আমি হতবাক।

ভিন্ন ধরণের আরও একটি মুদ্রাদোষের কথা বলি। আমার সহকর্মী পরমেশ জান্তে পারলে কিন্তু রেগে যাবে। তবে ভরসার কথা হচ্ছে পরমেশ আর যাই করুক পত্রিকা টত্রিকা বারেকের জন্য ওল্টায় না। ওর অন্য চিন্তা। চিন্তার ক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী ; শুধু পৃথিবী কেন পৃথিবীর বাইরের জগৎ চন্দ্র, বুধ, শুক্র, গ্রহ-উপগ্রহ মিশিয়ে। বিষয়—রাজনীতি। চাঁদে যাবার জন্য এত তাড়াহুড়ো কে া ? এই প্রশ্নের উত্তরে ওর বক্তব্য যদি শোনেন তো নিজেকে পরম মূর্খ মনে হবে। এই প্রসঙ্গে ও শুক্র গ্রহের অধিবাসীদের উত্তম, বুধ গ্রহবাসী মহাবৈজ্ঞানিকদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং পৃথিবীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতাদের—অবৈজ্ঞানিকোচিত জরদ্গবতা নিয়ে যে পরম রমণীয় আলোচনা আরম্ভ করবে তা যেমনই অভিনব তেমনি উর্বর। এ হেন পরমেশের—একটি মুদ্রাদোষ আছে। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হলে সে কথা কেউ বুঝবে না। বুঝবে না যে পরমেশ মাঝে মাঝে ভাবাপ্লুত হয়ে প্রকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে কী যন্ত্রণাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তার সর্বাধুনিক প্রকৃতি বর্ণনা : কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়।

পরমেশ : সেবার গিন্নীকে নিয়ে দারজিলিং গিয়েছিলাম ; ভাল কথা, তুমি দারজিলিং গেছ নাকি ?

—না, এখনও যাওয়া হয়নি।

—তবে শোন। দেখবার ওখানে কিছু নেই। খানিকটা বন-জঙ্গল আর চারিদিকে পাহাড় পর্বত। ওরই মাঝে আকর্ষণীয় বস্তু বলতে আমার যা মনে হলো—সে হচ্ছে সূর্যোদয়। আহা! সেকি দৃশ্য। ভোর হতে না হতেই তো আমরা যথাস্থানে গিয়ে হাজির। দেখতে দেখতে ভাই, সে কি বলব—শুধু রঙ আর রঙ—রঙের ছড়াছড়ি। ঠিক যেন—কি বলব তোমাকে ঠিকমতো বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল·····তুমিই বলনা। তুমি তো কবিতা ফবিতা পড়। মনে হচ্ছিল—আরে চেপে যাচ্ছ কেন—বলেই ফেল।

বললাম—আমি তো দেখিনি। কি রকম এফেক্ট হয় না দেখে বলি কি করে ?

—না দেখলেই বা। বলো, বললেই ঠিক বুঝবে। আমি ধীরে ধীরে দুটি কবিতার লাইন উচ্চারণ করে বললাম--এটা রবীন্দ্রনাথের।

পরমেশ রেগে খুন—তোমাদের সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথ! দেশটা গেল। অন্য কোন কবির লাইন দিয়ে সূর্যটাকে বর্ণনা করো।

বললাম—সূর্যটাকে কি স্বর্গীয় পাখির ডিমের মতো লাগছিল পরমেশ ?

পাখির ডিম? তোমার কি মাথা খারাপ! তুমি কি এতই মেটিরিয়ালিষ্ট হয়ে পড়েছ।

—এটা কবি জীবনানন্দ দাশের উপমা, পরমেশ।

—ও সব জীবানন্দ টীবানন্দ ছাড়।

একটা সাদা সাপ্টা বর্ণনা করতে পারছ না ?

ধমকের স্বরে পরমেশ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—অনেকটা এই রকম। মনে হচ্ছিল—ঘড়া ঘড়া অনেক রঙ কে যেন এক সঙ্গে আকাশে একেবারে উপুড় করে দিয়েছে—বুঝলে? তোমার কবিতা পড়াই সার হবে। কিস্সু বোঝ না।

সত্যিই আমি বুঝি না পরমেশ বক্তব্যের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ প্রকৃতির বর্ণনা দেয় কেন? এটা আবার কি ধরণের মুদ্রাদোষ?

মুদ্রাদোষের কথা বলতে গিয়ে কত কথাই যে এসে পড়ল। এমনি কত শত মুদ্রাদোষই না আছে। লিখতে গেলে শেষই হবে না। হিটলারের নাকি মুদ্রাদোষ ছিল—বক্তৃতা করতে করতে উত্তেজিত হলে উনি চশমাটাকে মুঠোয় গুঁড়িয়ে ফেলতেন। ক্ষিপ্তোন্মাদ এই ব্যক্তির মুদ্রাদোষের কথা জানতেন বলেই ওর সহযোগিরা সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে অন্য একটি চশমা ধরিয়ে দিতেন।

মুদ্রাদোষ যে শুধু কথা বার্তাতেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। শারীরিক বিভিন্ন ভাবে ভঙ্গিতেও এর প্রকাশ হয়। নস্যি নেবার আগে ডিবের মাথায় টোকা মারা, চশমা খোলা আর পরা, জামার ভাঁজ ঠিক রাখার জন্য শরীর ঝাকানি দেওয়া থেকে আরম্ভ করে—আয়না দেখলেই মুখ দেখা, ব্লেড পড়ে থাকলেই নখ কাটা, দেশলাই কাঠি পেলে কান খোঁটা, ফোন দেখলেই অকারণে ফোনে কথা বলা, গানের আসরে মাথা নাড়া, ভোজের আসরে হৈ-চৈ করা, প্রভৃতি বিবিধ মুদ্রাদোষ চোখে পড়ে।

এক মহিলা তো প্রায়ই বলেন—তাই নাকি? একজন কথায় কথায় বলেন—মাইরি বলছি। অবিবাহিত যুবতী মেয়েদের সাধারণ মুদ্রাদোষ—আপনি ভীষণ অসভ্য। কেউ কথা বলতে বলতে নিচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরেন, কেউ বা হঠাৎ জিভ কাটেন, কেউ বা বলেন—শোন কথা। এবং এটি বলবার সময় এমন চমৎকার একটি টান দেন যে মনে হয় বসে বসে ওঁর কথাই শুনি।

প্রতিবেশিনীর কাছে

রাজনৈতিক বক্তাদের মুদ্রাদোষ বক্তৃতাকালে 'বন্ধুগণ' বা 'ভাই সব' বলে চিৎকার করে ওঠা। ছাত্রদের মুদ্রাদোষ কথায় কথায় 'স্যার' বলা, ব্যবসায়ীদের মুদ্রাদোষ খদ্দেরের গলা কাটার সময় 'বাবু' বলা। অনেকের মুদ্রাদোষ ছোটবেলাকার সহপাঠি দেখলে 'তুই-তোকারি-শালা' প্রভৃতি বলে অন্তরঙ্গতাকে পরিস্ফুট করা।' আত্মীয়দের মুদ্রাদোষ কিছু দিন পর দেখলে 'চেহারাটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে' বলা। বিখ্যাত কবি কোলরিজের মুদ্রাদোষ ছিল কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় জামার বোতামটি ধরে তাকে বোঝানো। এমনও হয়েছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শ্রোতা তিতিবিরক্ত হয়ে বোতামটি ব্লেডে করে কেটে সটকে পড়েছে। ঘণ্টা দুই পর বিয়ের আসরে ভোজ সেরে ফেরার পথে দেখে কোলরিজ তখনও বোতামটি হাতে ধরে বুঝিয়ে চলেছেন।

রেডিওতে সময় সূচক ঘণ্টা ধ্বনি শুনে সঠিক ঘড়িকেও মিলিয়ে নেবার মুদ্রাদোষ হামেশা দেখা যায়। বন্ধু সুবিমলের মুদ্রাদোষ হলো অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ হলে হাত দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাওয়া এবং পরিশেষে—'আপনি একটু প্রোটিন ডায়েট সম্বন্ধে সচেতন হবেন' বলা। উকিলদের মুদ্রাদোষ, মক্কেলকে একথা সেকথার পর 'কত এনেছেন?' জিজ্ঞেস করা। আর মক্কেলদের মুদ্রাদোষ—এবারটা আপনাকে বিনা ফিতে কেসটা করে দিতে হবে, বলে আবদার করা। মহিলাদের মুদ্রাদোষ শাড়ী দেখলেই—'কাপড়টা বেশ ভাল' বলে সমনস্ক হওয়া। আমার এক মাষ্টার মশাইয়ের মুদ্রাদোষ ছিল একটি একটি করে গোঁফের চুল ছেঁড়া এবং সেটিকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। গান শুনতে গিয়ে গানের গ্রামার নিয়ে আলোচনা করে নিজেকে প্রকৃত সমঝদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাও এক প্রকার মুদ্রাদোষ। কথা বলতে বলতে টেবিল চাপড়ান, পা নাচানো অন্য প্রকারের মুদ্রাদোষ। পোড়া

দেশলাই কাঠি ঘসে গোঁফকে কলঙ্কিত করা আমার জনৈক পরিচিতের মুদ্রাদোষ।

এত কথা শোনার পর এখন যদি আমাকে আপনি প্রশ্ন করেন—মশাই আপনার মুদ্রাদোষটি কি।

বিশ্বাস যদি করেন তা হলে ভরসা রেখে বলি—বুয়েছেন আমার কোন মুদ্রাদোষ নেই। তবে বুঝেছেন আপনার মুদ্রাদোষ যে কি সেটি আমি কিন্তু সঠিক বলে দিতে পারি, বিশেষত যদি আপনি বিবাহিত ভদ্রলোক হন।

ভাবছেন সে কি করে সম্ভব আপনার সঙ্গে আমার তো আলাপই নেই। তাতে কি?

বুকে হাত দিয়ে বলুন তো সত্যি কিনা, যে কথারই অবতারণা করা হোক না কেন আপনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার 'ওয়াইফের' কথায় চলে আসেন না? 'ওয়াইফ' কথাটি বলবার সময় শব্দটিকে গিলে ফেলে আপনার ভাঙা গাল দুটি কেমন ফুলো ফুলো হয়ে ওঠে তার খবর আপনি রাখেন কি?

কি মশাই সত্যি কথা ফাঁস করে দেওয়ায় রেগে গেলেন নাকি? ঐটিই আপনার মহা মুদ্রাদোষ। বুয়েছেন। তবে বুঝলেন কিনা আমার কিন্তু কোন মুদ্রাদোষ নেই—বুয়েছেন।

উপন্যাস 'কামমোহিতম্' সম্পর্কে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—তোমার বই আমি শেষ পর্যন্ত পড়েছি। পড়তে পেরেছি। তোমার একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে মনে মনে যেন ভালো লেগেছে। তোমার নায়কের স্বীকৃতি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—তোমার বই এক বৈঠকে পড়ে শেষ করার মধ্যে তোমার কুশলতার পরিচয়ই আমি দেখতে পাচ্ছি। বইটা আমাকে নাড়া দিয়েছে এবং আমার বিশ্বাস মানুষকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা তোমার বইকেও ভালো না বেসে পারবেন না।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বইটি পড়ে আমার ভাল লেগেছে। শুধু তাই নয়, ওর বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং তাকে রূপদানের কৃতিত্ব আমার বেশ উঁচু জাতের মনে হয়েছে।

যুগান্তর—চলতি বাজারের ভিড়ে মিশে যাবার মতো উপন্যাস নয়। নিপুণ কারুকর্মের নিদর্শনরূপে বইটি আদরণীয় হবে।

দৈনিক বসুমতী—লেখকের ভাষা পরিবেশ ও বিষয়োপযোগী সুন্দর ও সাবলীল। তিনি গল্প বলতে জানেন ও সংযম ও শিল্প-চাতুর্যে যে দক্ষ তারও পরিচয় আছে কাহিনীর বিস্তারের মধ্যে।

আনন্দবাজার : 'সাহিত্য জগৎ'—স্বতন্ত্র এক রীতিতে বলা নতুন উপন্যাস। এর কাহিনীতে রয়েছে যেমন ভ্রমণ সাহিত্যের স্বাদ, তেমনি বহু অনাবিষ্কৃত তথ্যও। প্রাচীন ভারতের এক দেবী মূর্তিকে নিয়ে প্রচলিত উপকথাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন পুরোহিতের মুখ দিয়ে। ফলে উপকথার ও পুরোহিতের জীবন এবং লেখকের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এই ত্রিবিধ যোগ ঘটেছে।

অমৃত—নতুন রসের উপন্যাস।

মাসিক বসুমতী—কাহিনীবয়নে বিশেষ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর আছে। রচনার আদ্যোপান্ত এক সহজ আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ।

গল্পগ্রন্থ 'ফুলদানী ও শেষ হাস্নুহানা' সম্পর্কে

● রচনা কৌশল খ্যাতিমান লেখকদের সমপর্যায়ভুক্ত।

—দৈনিক বসুমতী

● গল্পে লেখকের জীবনবোধ ও পর্যবেক্ষণের স্বাক্ষর আছে।

—যুগান্তর

● নানা রঙের নানা মেজাজের গল্পের সঙ্কলন। লেখক তাঁর গল্প-গুলির মাধ্যমে আধুনিক মনের দাবিকে অনেকটা তৃপ্ত করতে পেরেছেন।

—আনন্দবাজার

● তিনি সুলেখক। সবগুলো গল্পই বিষয়বস্তুর দিক থেকে পাঠক মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম। একজন লেখকের পক্ষে একই গল্পগ্রন্থে এতগুলো ভালো গল্পকে স্থান দিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নয়। —দেশ

● গল্প শুধু গল্পের জন্য লেখা হয় না, সেই গল্পে জীবনের তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলাই সাহিত্যিক কর্তব্য। অত্যন্ত আশার কথা প্রথম গ্রন্থেই লেখক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। —পরিচয়

● তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর কয়েকটা স্পর্শকাতর গুণের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা। আমাদের কানে এখন 'দূরের বাজনার' মতো শোনালেও প্রতিভা ক্ষমতায় একদিন আমাদের মনের প্রতিবেশী হয়ে উঠতে বাধ্য। পশ্চিমবাংলার লাল মাটির অঞ্চল, শালের বন আর তাঁর ভেতরকার বিচ্ছিন্নবাদী নিঃসঙ্গ মানুষেরা যারা শান্ত, নিরুপদ্রুত, সমাজশাসিত, অথচ লোভ, হিংসা অনুভূতিতে ভালবাসায় মানুষের নৃতত্ত্বের উপায়হীন শিকার চিত্ত ভট্টাচার্যের গল্পে তাদেরই সচকিত পদপাত। চিত্ত ভট্টাচার্য নিজে কবি, সুতরাং ভাল গল্পকার হওয়ার ব্যাপারে একটা দরকারী পুঁজি ঈর্ষাজনক ভাবে তাঁর হস্তগত। পড়া শেষ হবার পরও তা আমাদের মস্তিষ্ককে মুক্তি দেয় না এবং এর চরিত্র এর ভেতরকার আকাশ পৃথিবী আমাদের মাথার চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে আমাদের ক্লান্ত করে। এমন একটা বই যাকে পড়া চলে বার বার।

—পরিক্রমা (পূর্ব পাকিস্থান)

গল্পগ্রন্থ 'দৃশ্যান্তর' সম্পর্কে

● আমাদের প্রাত্যহিক পথ চলার আশে পাশে যে হাজার মানুষের উপস্থিতি, যাদের দিকে আমরা তাকাই মাত্র, কিন্তু যাদের নিয়ে ভাবি না— সেই মানুষদের কথা চিত্ত ভট্টাচার্য গল্পে এনেছেন। জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে সাহিত্যে উপস্থিত করাই সাহিত্যিকের কর্তব্য, এ কর্তব্য পালনে তিনি সার্থক। এই সাধারণ মানুষের আশা-স্বপ্ন ভালবাসার কথাই গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। —পরিচয়

● আমাদের দেশে ছোটগল্পের চাহিদা কম, প্রকাশক তাজা ফুলুরির মতো যে গ্রন্থ বিক্রয় করা সম্ভব সেই বই প্রকাশে আগ্রহশীল। তাই গল্প-গ্রন্থের প্রচার কম, অথচ বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগটিই সর্বাধিক উন্নত। চিত্ত ভট্টাচার্যের গল্পগুলির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়েছি যে বৈশিষ্ট্য আজ বাংলা ছোট গল্পের মর্যাদা বৃদ্ধি করছে। জীবন দর্শনের উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর আছে। —অমৃত

● তাঁর গল্প গড়ার কৃতিত্ব যেমন লক্ষণীয়, তেমনি মনের গভীরে ডুব দিয়ে বিচিত্র জটিল ভাবদ্বন্দ্বের সূত্রগুলি খুঁজে বের করার নিপুণতাও নজর করার মতো। —যুগান্তর

● শুধু পরিমাণ নয় গুণগত উৎকর্ষই এই গল্পগুলির প্রধান বিশেষত্ব। মহান ঐতিহ্যের সঙ্গে নূতন রচনা শৈলীর সার্থক পরিণয় ঘটিয়ে লেখক বাংলা গল্পকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন এই সঙ্কলনটিতে। রচনারীতির কারুকার্যে, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, ঘটনা স্থাপনের স্বাভাবিকতায় প্রতিটি গল্পকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আন্তরিকতায় ও ঔজ্জ্বল্যে প্রতিটি রচনাই সমভাবে অনন্য। মানুষের অন্তরের গভীরে যে সব আকাঙ্ক্ষা, ঘাতপ্রতিঘাত ও বেদনার আলোড়নের সৃষ্টি করে, লেখকের বলিষ্ঠ লেখনীতে তারই প্রতিচ্ছবি, আর সেজন্যই রচনাগুলি হয়েছে সফল ও সার্থক। —মাসিক বসুমতী